শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক :

শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮।১বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সুবর্ণা

SUBARNA
Sailajananda Mukhopadhaya.

ডবল-ডেকার বাসের দোতলায় বসে কলকাতার বিধান সরণী দিয়ে যেতে যেতে লাল টকটকে সেই সাইনবোর্ডটাই দেখেছিলাম শুধু। সাইনবোর্ডের মালিকটিকে দেখিনি। দেখবার সুযোগ যে কোনোদিন হতে পারে—তাও ভাবতে পারিনি।

কিন্তু সুযোগ একদিন হলো।

আমার স্ত্রীর হয়েছিল অসুখ। ডাক্তারবাবু বললেন, অপারেশন করতে হবে।

আমার স্ত্রী কিন্তু অপারেশন কিছুতেই করাবে না।

শেষ পর্যন্ত প্রাণের দায়ে রাজী যদি-বা হলো, বলে কিনা হাসপাতালে যাবে না, নার্সিং-হোমেও না, অপারেশন যদি করতে হয় তো বাড়ীতেই করুক, মরতে যদি হয় তো বাড়ীতেই মরবো।

বাড়ীতেই অপারেশন হলো।

অপারেশনের পর ডাক্তারবাবু বললেন, চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে নার্স করবার লোকের দরকার।

পাশ করা নার্স হলেই যেন ভাল হয়।

চট করে আমার সেই লাল রঙের সাইন-বোর্ডটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

সাইনবোর্ডে লেখা ছিল—

মিস্ সুবর্ণা সরকার (নার্স এণ্ড মিড্ওয়াইফ)।

সোজা চলে গেলাম সেইখানে। দোরের কলিং বেল টিপতেই একটি মেয়ে এসে দরজা খুলে দিলে।

—কাকে চাই ?

সাইনবোর্ডটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, মিস্ সুবর্ণা সরকারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—আমিই সুবর্ণা সরকার। আসুন।

সামনের ঘরে গিয়ে বসলাম। সুন্দর সাজানো ঘর।

ঘর দেখবো না সুবর্ণা সরকারকে দেখব ?

ফর্সা ধপ্ ধপ্ করছে গায়ের রং, যেমন স্বাস্থ্য তার তেমনি রূপ

চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। মনে হয় যেন তিরিশের কাছাকাছি।

সুবর্ণা বললে, আমার চার্জ একটু বেশি।

যতই বেশি হোক, আমার তখন জেদ চেপে গেছে—একেই নিয়ে যেতে হবে। বললাম, তা হোক। কত আর বেশি হবে ?

—পঁচিশ। রুগী ব্যাটাছেলে, না মেয়েছেলে ?

বললাম, আমার স্ত্রী। বাড়ীতেই অপারেশন হয়েছে।

আর কিছু শুনতে চাইলে না সুবর্ণা। বললে, চলুন।

বললাম, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনি। আপনি ততক্ষণ তৈরি হয়ে নিন।

ফিরে এসে দেখি একটি ব্যাগ হাতে নিয়ে সুবর্ণা অপেক্ষা করছে। দরোয়ান-গোছের একজন লোক দাঁড়িয়েছিল কাছে। সুবর্ণা তার হাতে দোরের চাবিটা দিয়ে বললে, তোমার ভাতিজাকে শুতে বোলো এইখানে।

'বলবো।' বলে ব্যাগটা হাতে নিয়ে দরোয়ান ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে গেল।

সুবর্ণাকে পেছনে বসিয়ে আমি বসতে যাচ্ছিলাম ড্রাইভারের পাশে ; সুবর্ণা বললে, ওখানে কেন ? আপনি এইখানে এসে বসুন।

সুবর্ণার পাশেই আমাকে বসতে হলো। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বুঝি একা থাকেন ?

সুবর্ণা বললে, হ্যাঁ একাই থাকি।

রান্না করবার লোক আছে ?

সুবর্ণা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে। হেসে বললে, কেন, আমাকে দেখে কি আপনার মনে হচ্ছে—আমি রান্না করতে পারি না ?

বললাম, দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।

অথচ সারা জীবন ধরে আমি রান্নাই করেছি।

বলেন কি ?

সুবর্ণা বললে, নার্সিং যদি না শিখতাম, তাহলে কারও বাড়ীতে হয়ত রান্নার কাজ করেই জীবন কাটাতে হতো।

বিশ্বাস করতে পারলাম না। যে রূপ তার এখনও রয়েছে, যৌবনের মধ্যাহ্নদিনে সে রূপ ছিল আরও উজ্জ্বল। যে-কোনো পুরুষকে পাগল করে দেবার মত অসামান্য রূপের অধিকারিণী এই মেয়েটির মুখ থেকে অন্য কিছু শুনবো আশা করেছিলাম! এইরকম কত সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের কাহিনী আমার জানা আছে। সুবর্ণা সরকারেরও রূপের বহ্নিশিখায় কত পতঙ্গের কত আত্মাহুতির কাহিনী হয়ত লুকিয়ে আছে—সে সব কথা সে বলবেই-বা কেন ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে হলো যেন সে আপন মনেই বললে, আমার এ রূপ যেন না থাকলেই ভাল হতো।

বললাম, কিন্তু এই রূপের জন্যই তো মেয়েরা কেঁদে মরে।

সুবর্ণা বললে, না, রূপের জন্যে কাঁদে না।

বলেই সে চুপ করে রইলো। বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো সে। চলন্ত গাড়ীর বাইরে কলকাতা মহানগরীতে

তখন সন্ধ্যা নেমেছে। কোলাহলমুখরিত রাজপথ অতিক্রম করে গাড়া এসে দাঁড়ালো আমার বাড়ীর দরজায়।

টাকা দেবার জন্যে মনিব্যাগ বের করেছি, সুবর্ণা তখনও বসে আছে আমার পাশে। বললাম, মেয়েরা রূপের জন্য কাঁদে না তো কিসের জন্য কাঁদে—কই তা তো বললেন না?

তবু জবাব দিলে না সুবর্ণা।

আমার পিছু পিছু গাড়ী থেকে নামলো সে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে হবে। এইখানে এসে সুবর্ণা চুপিচুপি বললে, কাঁদে একটি সন্তানের জন্যে। মা হবার জন্যে কাঁদে মেয়েরা।

আমার স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে দেরি হয়নি সুবর্ণার। একই বয়স দুজনের।

তিনদিন যেতে না যেতেই আমার স্ত্রী একদিন ডেকে বললে, সুবর্ণা কি বলছে শোনো।

কি বলছে?

বলছে—তুমি যে গল্প-লেখক তা যদি জানতো সে—তাহলে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলতে পারতো।

সুবর্ণা কাছেই বসেছিল। বললাম, এখনও তো বলতে পারেন। বলুন না—শুনি!

সুবর্ণা বললে, গল্পের ব্যাকগ্রাউণ্ড তো পেয়ে গেছেন। আমার মত একটা মেয়ে দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে এই রকম জায়গায় একাই বাস করে, তারপর আপনি গেলেন আমার সাইনবোর্ড দেখে। নার্সের সন্ধানে—ব্যাস, এইবার তৈরি করে নিন। সব গল্পই তো এক। নারীদেহের প্রতি পুরুষের দুর্দমনীয় লোভ—

কথাটাকে শেষ করতে দিলাম না। বললাম, না এখনকার কথা নয়। পুরনো দিনে চলে যান।

সুবর্ণা বুদ্ধিমতী মেয়ে। বললে, বুঝেছি। আমার এই দেহের মূলধন নিয়ে কারবার কিছু করেছি কিনা তাই জানতে চান। সেদিক দিয়ে ভারি বোকা মেয়ে ছিলাম আমি। পারিনি কিছু করতে। করতে গিয়ে একদিন এমন মার খেয়েছিলাম —

বলে আর হাসে।

হাসতে হাসতে আমার স্ত্রীর গায়ে ঢলে পড়লো সুবর্ণা।

বললাম, সেই মার খাওয়ার গল্পটাই বলুন।

সুবর্ণা বললে, সে একেবারে সাদামাঠা গল্প তাতে আপনার বিশেষ কিছু সুবিধে হবে না। সে গল্প লিখলে কেউ পড়তেই চাইবে না।

ধরে বসলাম, তাই বলুন, আমি শুনবো।

সুবর্ণা বললে, মা যখন মারা গেল, আমার বয়েস তখন তেরো কি চোদ্দ। ফ্রক ছেড়ে তখন শাড়ী পরছি। বাবাকে চারটি রান্না করে দিই। খেয়েদেয়ে বাবা কাজে চলে যায়। বাড়ীতে আমি একা। পাড়ার ছেলেগুলো পেছনে লাগে। ঘেন্না ধরে গেছে ব্যাটা-ছেলেদের ওপর। এর বাড়ী ওর বাড়ী পালিয়ে গিয়ে বসে থাকি। কিন্তু যেখানে যাই সেইখানেই জ্বালা। কোথাও আর তিষ্ঠুতে পারি না। সবাই বলে মেয়েটার একটি বিয়ে দিয়ে দাও বাবা বলে, তোমরা থামো। মেয়ের এখনও বিয়ের বয়েস হয়নি। মাঠ থেকে যেদিন একটা মোটা টাকা আনবো, তার পরদিনই ওর বিয়ে দেবো! রেসের মাঠ থেকে বাবা যেদিন হেরে বাড়ী ফিরতো সেদিন এত বেশি মদ খেতো যে তার আর কোনও জ্ঞান-গম্যি থাকতো না। বসে বসে ঘোড়াগুলোর নাম ধরে ধরে গালাগালি দিতো, আর খাবার জন্যে ডাকতে গেলে বলতো, চোপরাও ডঙ্কি। এক-একদিন বাবার চোখের সামনে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে নিজে খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। এমনি

করতে করতে একদিন বাবা আর বাড়ী ফিরলো না। বাড়ীতে আমি একা। আমার বয়েস তখন—বুঝতেই তো পরছেন—ষোলো কি সতেরো। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছি, কিন্তু ঘুম আর আসছে না। পাশের বাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজলো। হঠাৎ শুনি বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। এতক্ষণ পরে বাবা এলো বোধ হয়। ছুটে দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু দোর খুলতে ভরসা হচ্ছে না! যদি বাবা না হয়! এমন সময় বাইরে থেকে শুনলাম—দোর খোল সুবী, আমি কাকাবাবু।

বাবার সঙ্গে আপিসে কাজ করে—অনিল বিশ্বাস। আমি তাকে কাকাবাবু বলে ডাকি—দোর খুলতেই দেখি—কাকাবাবু একা নয়, সঙ্গে তার বড় ছেলে। গুরুচরণ।

কাকাবাবু বললে, যে কথাটা তোকে বলতে এলাম—শোন্। তোর বাবার একটা এ্যাক্সিডেন্ট্ হয়েছে ভালই আছে। হাসপাতালে রয়েছে। এত রাত্তিরে তো তোকে যেতে দেবে না। কাল সকালে এসে নিয়ে যাব তোকে। রাত্তিরে একা থাকবি বাড়ীতে তাই গুরুকে সঙ্গে নিয়ে এলাম! ও থাক এইখানে। আমি চলি।

গুরুকে রেখে কাকাবাবু চলে গেল!

গুরুকে জিজ্ঞাসা করলাম. কিরকম এ্যাক্সিডেন্ট্ রে গুরু?

গুরু বললে, আজ শনিবার—

বললাম, জানি, আজ 'রেস' ছিল।

গুরু বললে, বাবাও ছিল সংগে! মায়ের ভয়ে আমার বাবা তো মদ খায় না। তোমার বাবা খেয়েছিল। তারপর মোটর চাপা পড়েছে।

বেঁচে আছে তো?

গুরু বললে, তা কেমন করে জানাবো? বাবা তো বলছে—ভাল আছে।

রাতটা কাটলো কোনোরকমে! সকালে উঠে দেখি—হাতমুখ ধুয়ে গুরু একটা ইতিহাসের বই নিয়ে পড়তে বসেছে!

বই কি তুই সঙ্গে এনেছিস?

গুরু বললে, যদি দু'চার দিন থাকতে হয়। ইতিহাসটা আমার মুখস্থ হয় না কিছুতেই, তাই ইতিহাসটা নিয়ে এসেছি।

ছেলেটার পড়ায় খুব ঝোঁক। বার-বার ফেল্ করে, তবু পড়তে ছাড়ে না। আমার চেয়ে বছর-খানেকের ছোটই হবে।

কাউকে পড়তে দেখলে আমার নিজের পড়ার কথা মনে পড়ে। বাপের আপিসেয় ভাত দেবো, না ইস্কুলে যাব? তবু আমি ওই বয়সেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিলাম।

আমরা বসে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় কাকাবাবু এলো। হাতে বাজারের থলে। বললে দশটার আগে হাসপাতাল খুলবে না। এই নে আমি বাজার করে এনেছি। তোরা চারটি রান্না করে খেয়ে নে।

রান্না করে খেয়ে দেখি খাট এসেছে ফুল এসেছে, শ্মশানে যাবার জন্যে লোকজন সব প্রস্তুত। কাকাবাবু সব ব্যবস্থাই করেছে। শুধু আমাকে জানায়নি সত্যি কথাটা। বাবা কাল রাত্রেই মারা গেছে।

সব শেষ হয়ে গেল।

আমার চোখের সামনে পৃথিবীটা হয়ে গেল অন্ধকার।

কাকাবাবু বললে, তোকে আর কোথায় ফেলবো, চল তুই আমার বাড়ীতেই চল্।

আশ্রয়হীনার আশ্রয় মিল্‌লো!

গেলাম কাকাবাবুর বাড়ীতে।

কাকাবাবুকে দেখেছি গুরুকে দেখেছি, আর কাউকে দেখিনি। আর কেই-বা আছে বাড়ীতে? কাকামা আর তার কোলে একটি দু-তিন বছরের ছেলে। বড় ছেলে গুরুচরণ, তারপর বুড়ো বয়সে তার এই ছেলেটি হয়েছে। তার জন্যে কাকাবাবুর গঞ্জনার আর অন্ত নেই!

কাকীমার মত মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি আমার জীবনে। দেখতে খুব কুৎসিতও নয়, সুন্দরীও নয়। আঁট-সাঁট বাঁধন—গায়ের রং কালো। দিনরাত শুধু ঘুরছে ফিরছে আর বকছে।

—ছেলের ইস্কুলের ভাত, বাবুর আপিসের ভাত, তার ওপর আছে এই ডামাল ছেলে, কোন্ দিক সামলাই বলতে পারো?

কাকাবাবু বলে, আবার চেঁচাচ্ছো কেন? ওই তো সুবর্ণাকে এনে দিয়েছি। করাও না তাকে দিয়ে কত কাজ করাবে।

কাকীমা এতক্ষণ আপন মনেই বকছিল, এইবার শোনাবার একটা মানুষ পেয়ে আরও জোরে জোরে ও চেঁচিয়ে উঠলো, তুমি থামো। তোমাকে দেখছি আর আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে। তোমার মত মানুষকে আগাপাস্তালা ঠ্যাঙ্গাতে হয়।

অপরাধের মধ্যে অপরাধ—কাকাবাবু একটু হেসে কথা বলেছিল—কেন গো এত রাগ কেন?

—আ মরি মরি! কিছু যেন জানে না! পাড়া-পড়শীর কাছে মাথাটা আমার দিলে হেঁট করে! গুরুর বিয়ে দিলে এতদিন তুমি নাতির মুখ দেখতে। তা—না, নিজের ছেলে হলো। লজ্জাও করে না।

এতক্ষণ পরে তার রাগের হেতুটা বুঝতে পারলে কাকাবাবু। বললে, দেশ-দুনিয়ার লোকের বলে গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে হচ্ছে, আর দোষ যত আমারই বেলায়—না? দাঁড়াও আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ছেলের ঝামেলা তোমাকে আর পোয়াতে হবে না! সুবর্ণাকে ডেকে আমি বলে দিচ্ছি!

এই বলে আমাকে বোধকরি ডাকতে যাচ্ছিল কাকাবাবু। কাকীমা একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলে আমি কাছাকাছি কোথাও আছি কিনা। আমি ছিলাম দোরের আড়ালে। কাকীমা বললে, খবরদার বলছি—ওর সঙ্গে তুমি বেশি মাখামাখি করবে না। ডব্‌ডবে

ছুঁড়িটাকে নিয়ে এলো চোখের সামনে। তোমাকে আমি বিশ্বাস করিনা

কাকাবাবু বললে, আঃ, ছি ছি ছি ছি ! ও যে আমাকে কাকাবাবু বলে।

—কাকা কেন, বাবা বললেও বিশ্বাস করতুম না।

বলেই কাকীমা আমাকে ডাকতে লাগলো—বলি ও সুবী -- সুবী !

আমি যে সব শুনতে পেয়েছি সেটা না জানিয়ে একটু দেরি করে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম—বললাম, ডাকছিলে আমাকে ?

—হ্যাঁ ডাকছিলাম। ঘর-সংসারের কাজকর্ম জানিস ?

বললাম, জানি।

—জানিস তো যা হেঁসেলে যা ! কি করতে হবে শুনে নে আগে। বেশী কথা বলতে আমি ভালবাসি না।

এই বলে কাকীমা আমাকে সারাদিনের প্রোগ্রাম বুঝিয়ে দিলে।

—রাত থাকতে উঠে উনোনে আগুন দিবি। উনোন ধরবে, তুই ততক্ষণ আমার জন্যে চারটিখানি ময়দা বের করে ঘি বের করে হাতের কাছে সব ঠিকঠাক করে রাখবি। প্রথমেই করবি আমার জন্যে ছোট ছোট দশখানি লুচি, দুটি আলু ভাজা একটি বেগুন ভাজা। বাস্, তার পর চা।

বললাম, গুরুকে আর কাকাবাবুকে লুচি দেবো না ?

কাকীমা রেগে উঠলো।—তুই যে আমার কথার ওপর কথা বললি বড় ? বলছি না—আমি বেশি কথা বলতে ভালবাসি না ! ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় সময় ওরা ভাত খাবে। একজনের ইস্কুল একজনের আপিস। এই সময় ভালবেশে তুই যদি ওদের লুচি খাইয়ে দিস ন'টার সময় ভাত খেতে পারবে ?

চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। কাকীমা বললে, চুপ করে রয়েছিস্ কেন ? বল্ ! পারবে খেতে ?

বললাম, না !

—বাস্। চা হয়ে গেল। তারপর ভাত ডাল তরকারি, আলুভাজা, বেগুনভাজা, আর টক্। দুখানা মাছ ওদের ভেজে দিবি। তারপর ওদের দু' বাপ্-ব্যাটার ছুটি করে দিয়ে তুই বসবি মাছ নিয়ে। মাছের ঝোল, ঝাল, নয়তো কালিয়া। যেদিন যেমন মাছ থাকবে সেদিন তেমনি তেমনি করতে হবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করে নিবি।—এই তো দিনের ব্যাপার চুকে গেল —উঁহুঁ উঁহুঁ চোকেনি। আমার আবার সব কথা মনে থাকে না। আমার দুধটা ক্ষীর করে দিতে হবে। ছেলের মা হয়েই আমার হয়েছে এক জ্বালা। খাবার পর ক্ষীর আর পাটালি গুড় দিয়ে চারটি ভাত না খেলে গায়ের রক্ত সব জল হয়ে যাবে। আমার পাতেই তুই চারটি খেয়ে নিবি। আবার একটা থালা কেন এঁটো করবি ? তোকেই তো মাজতে হবে, না কী বল ! তারপর—তারপর—দাঁড়া একটু ভাবতে দে।

চোখ বুজে একটু ভেবে কাকীমা আবার আরম্ভ করলে।

—ভাববার কি আছে ? ছেলেটা আবার এমনি দুষ্টু হয়েছে, নিজেও ঘুমোবে না, আমাকেও ঘুমোতে দেবে না। খাবার পর একটু গড়িয়ে না নিলে আমার আবার মাথা ধরবে ! তুই তখন নিবি ছেলেটাকে। একটু খানি এদিক-ওদিক করতে না করতেই তিনটে বাজবে। প্রথমেই এঁটো বাসনগুলো মেজে নিবি। তার পরেই ঠিক সকালে যেমন করেছিলি এবেলাও তেমনি ছোট ছোট দশখানি লুচি আর চায়ের সঙ্গে একটুখানি হালুয়া।—হ্যাঁ, এ-বেলা বরং বলতে পারিস গুরু আসবে ইস্কুল থেকে-ওকে একটু হালুয়া আর খান-দুই রুটি দিবি। তারপর রাত্রের জন্যে ওদের দু' বাপ্ ব্যাটার রুটি তরকারি আর ডাল। গুরু আবার সব দিন রুটি খেতে চায় না। ভাত খায়। দিবি চারটি ভাত চড়িয়ে। আমি কিন্তু রুটি একেবারে মুখে দিতে পারি না ! আমার জন্যে খান-আষ্টেক পরোটা তৈরি করাব। তুই কি খাবি ? রুটি না ভাত ?

কি বললে কাকীমা খুশী হবে বুঝতে পারলাম না। বললাম, যা পাব তাই খাব।

—এই ছাখ্, হেঁয়ালি আমি পছন্দ করি না। যা বলবি এক কথা বলবি। আমি এককথার মানুষ। দেখছিস্ না—গুরুর বাপের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা কচ্‌কচি আমার লেগেই আছে। কিসের জন্যে? লোকটা এক কথার মানুষ নয় বলে'।

বললাম, আমি রুটিই খাব।

—বাস্। এইবার ছুটি। তোরও ছুটি, আমারও ছুটি।

ছুটি যে কেমন হলো তা আমি বেশ ভাল করেই বুঝতে পারলাম। রান্নাঘরেই যাচ্ছিলাম, কাকীমা ছেলেটাকে ধরিয়ে দিলে—যাও বাবা যাও, তুমি তোমার নতুনদিদির কাছে যাও। একটা কাঁচকলা না হয় বেগুন হাতে ধরিয়ে দিবি, তাই নিয়ে দেখবি খেলা করবে বসে বসে।

আবার ফিরে ডাকলে কাকীমা। বললে, যে-কাপড় পরে রয়েছিস ওটা তোর কাচা কাপড় তো?

কাচা-আকাচা জানি না, দু'খানি মাত্র কাপড়। স্নান করে পরেছি।

—না। আ-কাচা কাপড় পরে রান্না করলে চলবে না। ওই ছাখ্ আলনায় আমার যে পুরনো কাপড় আর জামাটা রয়েছে, ওই দুটো নিগে যা। উল্‌টো-পাল্‌টা করে পারবি, তা'হলেই হবে।

নিলাম। জমাটাও নিলাম, কাপড়টাও নিলাম। পরতে গিয়ে দেখি কাপড়টা ছেঁড়া—সেলাই করা। আর জামাটা বড়, তার ওপর এমন একটা বিশ্রী জায়গায় ছেঁড়া যে বার-বার সেখানে কাপড় চাপা দিতে হয়।

ভেবেছিলাম সেলাই করে নেবো, কিন্তু ছুঁচ-সূতো পেলাম না। তার ওপর ছেলেটা সেদিন ঘুমের ঘোরে আমাকে তার মা ভেবে সেইখানে তার হাত ঢুকিয়ে জামাটা আরও খানিকটা দিলে ছিঁড়ে।

কোনোরকমে গিঁট দিয়ে পরেছিলাম জমাটা।

গুরু অনেকক্ষণ খেয়ে গেছে। কাকাবাবু তখনও খায়নি।

খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে কাকীমার কাছে দিয়ে এসে আমি পরোটা বেলছিলাম।

কাকাবাবু খেতে এলো।

বললাম, বোসো। আমার হয়ে গেছে।

আসনটা পেতে দিলাম।

কাকাবাবু কিন্তু বসলো না। আলোর বাল্‌বটার দিকে তাকিয়ে বললে, এই আলোয় রান্না করতে তোর কষ্ট হয় না?

—কাকীমা বুঝি সব কাজ তোর ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে?

চুপ করে রইলাম। হাতের কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নিচ্ছিলাম। কাকাবাবু তার পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে উনোনের আগুনে সেটা ধরিয়ে নেবার জন্যে বসলো আমার পাশে।

—তোর কাকীমা কি করছে?

—ঘুমোচ্ছে।

কাকাবাবু বললে, এ কি রে? এই ছেঁড়া জামা পরেছিস?

এই বলে আচমকা হাত বাড়িয়ে কাকাবাবু যে-কাণ্ড করে বসলো তাকে একেবারে নির্দোষ বলে উপেক্ষা করতে পারলাম না। সমস্ত শরীরটা সির সির করে উঠলো। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। জীবনে সেইদিন সর্বপ্রথম। আমার মনে হলো—এ পৃথিবীতে আমি একা পুরুষ-জাতটার ওপর মন আমার বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। যে-কথা আমি কোনোদিন ভাবিনি, সেদিন সেই কথাটাই যেন বড় বেশি করে মনে হতে লাগলো। এই পৃথিবীতে দুটো মানুষের চেহারা কখনও এক রকমের দেখিনি! না চেহারায়, না কণ্ঠস্বরে। কিন্তু এইখানে সব পুরুষ মানুষের মনের চেহারা যেন এক। একমাত্র আমার বাবার চোখ ছাড়া আর যে-কোনও পুরুষের চোখে আমার চোখ পড়েছে,

সেইখানেই দেখেছি সেই একই রকমের কামার্ত লোলুপতা। সে-চাউনি মানুষের চাউনি নয়, জানোয়ারের চউনি। এমন-কি গুরুর চোখেও দেখছি সেই একই আগুন মাঝে মাঝে ঝিলিক মেরে মেরে উঠছে।

ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছে সেখান থেকে।

কিন্তু কোথায় যাব ?

একের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে শত সহস্রের হাতে গিয়ে পড়বো। তার চেয়ে থাকি এইখানে। কারও মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাই না। সে জামাটা আর গায়ে দিই না। একটি মাত্র ভাল জামা, খোকনের জামা প্যাণ্ট্‌ কাচবার সময় সেই সাবানের ফেনা দিয়ে কেচে কেচে শুকিয়ে শুকিয়ে পরি।

কাকীমা বলে, সাবান বেশি খরচ করিস না সুবী. সাবানের দাম আজকাল বড্ডো বেড়ে গেছে।

আমি কি খাই না খাই, পরি না পরি সেদিক দিয়ে কাকীমার দৃষ্টি একটু সজাগ হয়ে উঠেছে। বলে, সারা দিন-রাত খাটছিস তুই আমি কি আর দেখি না ভেবেছিস ? সব দেখি। আসবা-মাত্তর আমার একখানা শাড়ী দিলাম, জামা দিলাম। ছিঁড়ুক, ছিঁড়লে আবার দেবো।

কাকাবাবু আর গুরু দিনের বেলা এক-সঙ্গেই খেতে বসে।

খেয়েদেয়ে উঠে যাবামাত্র কাকীমা রান্নাঘরে ঢোকে।

—খাওয়ার ছিরি দ্যাখ্‌ না! যেমন বাপ্‌ তেমনি ব্যাটা। থালার চারিদিকে কত ভাত ফেলেছে ত্যাখ্‌। একটা লোকের পেট ভরে যায়!

এই বলে ফেলে-যাওয়া উচ্ছিষ্ট ভাত মাছের কাঁটা তরিতরকারি, যা-কিছু পড়ে থাকে নিজের হাতে মাটি থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করে রেখে দেয়। বলে, এইগুলো তুই খেয়ে নিবি সুবি। কাক-পক্ষীর পেট ভরিয়ে কি হবে ? তার চেয়ে মানুষে খাক্‌।

গেরস্তঘরের এতটুকু জিনিস নষ্ট করতে নেই। নষ্ট করলে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়। আর নষ্ট করলে পাবো কোথায় বাছা? ওই তো একটা লোকের ওপর ভরসা। তাও চুরি-চামারি করে দু'পয়সা উপরি পায় বলেই রক্ষে। তা নইলে কি যে হতো কে জানে।

কাকীমার কথাগুলো শুনতে ইচ্ছে করে না, তবু শুনতে হয়। এঁটোকাঁটা খেতে ইচ্ছে করে না, তবু খেতে হয়।

এই কী জীবন?

এই জীবন আমি যাপন করবো? কি দুঃখে এবং কার জন্যে?

প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে করছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে—এই বন্দীশালা থেকে পালিয়ে যাই। বাইরের আলো-হাওয়ায় প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচি।

মনের মত একটি মানুষও কি পাব না। পেতে গিয়ে ভুল পথে যদি পা বাড়াই তো বাড়াবো। তাতেই বা কার কি বলবার আছে?

এমনি যখন মনের অবস্থা, তখন একটি অঘটন ঘটে গেল। কাকীমার ভাই এলো বহরমপুর থেকে কলকাতা দেখবার জন্যে। বাবু-বাবু চেহারা দেখতে শুনতে ভালই। বি-এ পাশ করে কিসের যেন একটা ব্যবসা করে প্রচুর টাকা রোজগার করে।

কাকীমা আমাকে ডেকে বলে দিলেন, রবি দুদিনের জন্যে এসেছে। ভাল করে খেতেটেতে দিস।

বললাম, তোমাকে যা দিই তাই দেবো তো?

হ্যাঁ তাই দিবি।

সেদিন সকালে লুচির দুখানা প্লেট সাজিয়ে দিয়ে এসেছি দুই ভাই বোনের হাতে। তার পরেই চা নিয়ে যাচ্ছি। আমার দু'হাতে দুটি চায়ের কাপ। দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই আমার কানে এলো রবিবাবু বলছেন, মেয়েটি বেশ সুন্দরী মেয়ে। আহা বেচারা।

বুঝলাম, আমার সম্বন্ধেই কথা হচ্ছে তাদের।

কিন্তু আহা বেচারা কথাটা আমার কানে যেতেই চোখ দুটো জলে ভরে এলো। চোখের জল মুছতে পারি না, দুহাতে দুটো কাপ। অথচ দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে মাথা হেঁট করে চায়ের কাপ দুটি নামিয়ে দিয়েই পালিয়ে আসছিলাম, রবিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি নাম তোমার?

মুখ না তুলে পারলাম না। তেমনি জলভরা চোখেই তাকালাম রবিবাবুর দিকে। বললাম, সুবর্ণা।

বলেই যেই পেছন ফিরেছি, আবার রবিবাবু বললেন, কাল আমরা থিয়েটার দেখতে যাব। তুমি যাবে তো আমাদের সঙ্গে?

কথাটা কাকামার ভাল লাগলো না।

—তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি রবি। ও আবার থিয়েটার কি দেখবে?

রবিবাবু বললে, তুই কী মেজদি? ও থিয়েটার দেখবে না? কেন?

কাকীমা বললে, রান্না কে করবে?

রবিবাবু বললে, রান্না করতে হবে না। সবাইকে আমি হোটেলে খাইয়ে দেবো।

—সবাই আবার কে? আমি তো যাব না।

—কেন, যাবি না কেন?

—খোকা আমাকে থিয়েটার দেখতে দেবে? খালি খালি বলবে —এটা কি, ওটা কি। হয়ত বা এমন কান্না কাঁদবে যে, আমাকে তাড়িয়ে দেবে থিয়েটার থেকে। তার চেয়ে তুই একা যাচ্ছিস্ একাই যা। একে ওকে টানাটানি করতে হবে না।

কাকীমার নজর পড়লো আমার ওপর। আমি তখনও দাঁড়িয়ে

ছিলাম সেইখানে। কাকীমা বললে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা।

গুরু ইস্কুলে যাবে, কাকাবাবু যাবে আপিসে, ন'টার সময় তাদের ভাত দিতে হবে। সত্যিই তো, আমার সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেন? চলে গেলাম রান্নাঘরে কি যে তাদের কথা হলো কিছুই শুনতে পেলাম না।

সারাটা দিন শুধু এই রবিবাবুর কথাই ভাবলাম। খেয়েদেয়ে সেই যে বেরিয়ে গিয়েছিল ফিরে এলো অনেক রাত্রে। সবাইকার খাওয়া হয়ে গেছে। আমি শুধু বসে আছি তারই প্রতীক্ষায়! দুখানি কাপড়ের ভেতর যেখানি ভাল সেইটি পরেছি, সন্ধ্যেবেলা গা ধুয়েছি। গায়ে মাখবার ভাল সাবান একটু পেলে ভাল হতো। কিন্তু কোথায় পাব? কাকামার সাবানে হাত দেবার উপায় নেই। কাপড়কাচা মোটা সাবানের একটি টুকরো পড়েছিল, তাই দিয়ে হাত-মুখ ধুয়েছিলাম। হাত-মুখ চড় চড় করছে। পুরনো দাঁতভাঙ্গা চিরুণী একটা দিয়েছিল কাকীমা। তাই দিয়ে ভাল করে চুল আঁচড়েছি! কপালে সিঁদুরের একটি টিপ পরেছি।

রান্না ঘরে পরিপাটি করে আসন পেতে খেতে দিয়েছি রবিবাবুকে। উনোনে কড়াই চড়িয়ে লুচি ভেজে ভেজে দিচ্ছি।

রবিবাবু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, যাবে তো আমার সঙ্গে?

কাকীমার মুখখানা মনে পড়লো। তবু বললাম-যাব।

—কোথায় যাবি?

সর্বনাশ! যা ভয় করেছিলাম তাই। কাকীমা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারিনি। হাতের লুচিখানা রবিবাবু থালায় তুলে দিলাম। রবিবাবুর বললে, থাক, আর দিতে হবে না।

কাকামা আবার জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবি? থিয়েটারে?

রবিবাবু বললে, ওকে কি জিজ্ঞাসা করছিস? আমি বলছি ও যাবে।

কাকীমা বললে, আমি যাব না কিন্তু।

—নাই-বা গেলি!

—তোর সঙ্গে ও একা যাবে?

কথাটা শুনে রবিবাবু কাকীমার মুখের দিকে কটমট করে তাকালো। বললে, আমাকে কি ভাবিস তুই? মানুষ বলে মনে করিস না—না কী?

ছোট এই ভাইটির কথা বলবার ভঙ্গী দেখে কাকীমা বোধকরি ভয় পেয়ে গেল। বললে, না না তা বলছি না। আমি ভাবছি—

রবিবাবু বললে, কি ভাবছিস তা আমি জানি। কুড়িয়ে-পাওয়া ও মেয়েটার জন্যে তোকে আর অত ভাবতে হবে না।

কাকীমা বোধকরি একটু নরম হলো। বললে, তবে নিয়েই যা। তোকে তো আমি জানি। যা জেদ ধরবি তা তুই না করে ছাড়বি না। তোর যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে তো যা ওকে নিয়ে থিয়েটার দেখে আয়।

রবিবাবুর খাওয়া তখন হয়ে গেছে। কথাটা শুনে বোধহয় খুশী হলো। হাসতে হাসতে বললে, থিয়েটার দেখতে যাব, ওইরকম একটা মেয়ে সঙ্গে থাকবে, সবাই ভাববে আমার বৌ। হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে আমাদের দিকে। দারোয়ানগুলো সেলাম ঠুকে পথ ছেড়ে দেবে।

কাকীমা বললে, দূর বোকা! সিঁথিতে সিঁদুর নেই। বৌ ভাববে কেন রে?

—বৌ না ভাবুক বোন ভাববে।

কাকীমা বললে, তুই তাইতেই খুশী?

এই বলে দু-ভাইবোনে খুব হাসাহাসি করতে লাগলো।

তার পরের দিন।

সেদিনের সন-তারিখ কিছুই আমার মনে নেই। লিখে রাখা উচিত ছিল। কারণ এমন একটি দিন মানুষের জীবনে খুব কমই আসে!

বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলাম রবিবাবুর সঙ্গে। রাস্তায় গিয়েই সে আমার আপদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করতে লাগলো। খুব খারাপ লাগছে, তবু কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছি না।

খানিক দূর যাবার পর সে-ই প্রথমে কথা বললে।

—তোমার আর বুঝি শাড়ী-জামা নেই?

মাথা নেড়ে বললাম, না।

—দেখেই বুঝতে পারছি খুব কষ্টে আছ এখানে! আমার এই মেজদিটিকে তো আমি চিনি।

চুপ করে রইলাম!

একটা ট্যাক্‌সি পেরিয়ে যাচ্ছিল, সেই ট্যাক্‌সি থামিয়ে রবিবাবু বললে, ওঠো!

ট্যাক্‌সিতে উঠে রবিবাবু বললে, ভাববার কিছু নেই। তোমাকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাব না।

মনে মনে বললাম, পালিয়ে গেলে আমি বাঁচি। কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারলাম না!

ট্যাক্‌সি গিয়ে দাঁড়ালো বিরাট একটা দোকানের সামনে। দোকানে ঢুকে রবিবাবু বললে, তোমার ইচ্ছেমত জামা-কাপড় কিনে নাও।

বললাম, আমি পারব না। আপনি কিনে দিন।

বুঝেছি। বলে রবিবাবু এগিয়ে এলো।

দোকান থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন আর আমাকে চেনবার উপায় নেই। পায়ে স্লিপার, পরণে দামী শাড়ী, গায়ে সুন্দর জামা। রবিবাবুর হাতে একটা ব্যাগের ভেতর আরও কিছু শাড়া-জামা এবং মাথার চিরুণী থেকে আরম্ভ করে প্রসাধনের যাবতীয় সামগ্রী।

—এ সব কী করলেন আপনি? আমাকে কি আবার সেইখানেই ঢুকিয়ে দেবেন?

রবিবাবু বললেন, কোথায়?

—আপনার মেজদির কাছে?

—কেন? ক্ষতি কি?

বললাম, আপনি থাকলে কোনও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আপনি তো পালিয়ে যাবেন।

রবিবাবু রাস্তার ওপর থমকে থামলো। কি যেন ভেবে বললে, তোমার জীবনের কথা—মেজদির মুখ থেকে যা শুনেছি তার চেয়ে বেশি কিছু জানি না। চল, এবার তোমার মুখ থেকে শুনবো। অবশ্য তোমার যদি কোনও আপত্তি না থাকে।

আমার আপত্তি?

দু' চোখ আমার জলে ভরে এলো। বললাম, আমাকে আপনি বাঁচান

থিয়েটার দেখা হলো না। দুজনে বসলাম গিয়ে গড়ের মাঠের নিভৃত একটি গাছের তলায়। আমার জীবনের ঘটনা কীই-বা আছে বলবার? রেঙ্গুড়ে মাতাল এক বাপের কাছে মানুষ হয়েছি। মা মরে গেছে অনেকদিন আগে। বললাম, রূপ নিয়ে জন্মেছি—এই আমার সব চেয়ে বড় অপরাধ।

—অপরাধ কেন?

অপরাধ নয়? ব্যাধের ভয়ে পাখী যেমন ছুটে ছুটে পালিয়ে বেড়ায় তেমনি করে ভয়ে ভয়ে আমার জীবন কাটছে।

রবিবাবু জিজ্ঞাসা করলে, এখানে তোমার সে ভয় কিসের ?

যে কথা বলবার ইচ্ছে ছিল না সেকথাও বলতে হলো।

নিঃসঙ্কোচে বলে ফেললাম কাকাবাবুর কীর্তির কথা। বললাম—

—যে কাকাবাবু আমার বাবার বন্ধু, বাবা মারা যাবার পর যিনি আমাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন, সেই কাকাবাবুই একদিন এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসলেন যে, আমি লজ্জায় মরে গেলাম ! বাড়ী থেকে একা বেরিয়ে যাবার সাহস নেই, তাই পালাতে পারি না, মরবার সাহস নেই তাই মরতে পারি না। প্রতি মূহূর্তে মনে হতে লাগলো—এরকম করে বেঁচে থেকে কোনও লাভ নেই। হয়ত বা একদিন আত্মহত্যাই করে বসতাম। এমন সময় আপনি এলেন।

রবিবাবুর মুখখানা হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। খানিক চুপ করে থেকে বললে, থাক আর বলতে হবে না। দেখি তোমার কি ব্যবস্থা আমি করতে পারি।

রবিবার আপিস বন্ধ। কাকাবাবু বাড়ীতেই ছিল। রবিবাবু বললে, অনিলদা, শোনো।

ভয়ে আমার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগলো। তবে কি সেই কথাটা বলে দেবে নাকি কাকাবাবুকে ?

কাকীমা তখন আমাকে নিয়ে পড়েছে।

—এরকম দামী শাড়ী আমি যে জীবনে কোনোদিন পরিনি রে ! কই দেখি—

বলে সে রবিবাবুর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে একটি একটি করে সব জিনিস বের করে আর বলে, সর্বনাশ ! রবির সবেতেই বাড়াবাড়ি। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, আর যেটা পরে রয়েছিস—এই পাঁচটা নতুন শাড়ী কিনে দিয়েছে ?

বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু পুরনো যে শাড়ীটা আমি পরে গিয়েছিলাম সেটা কোথায় ?

কাকীমা কি ভাবলে জানি না হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো, আমাকে চোর বলছিস? আমি কি তোর শাড়ী চুরি করলাম তোর চোখের সামনে থেকে?

কাকীমার চীৎকার শুনে রবিবাবু এসে দাঁড়ালো।

—কি হলো?

কাকীমা কিছু বলবার আগেই আমি বললাম, যে শাড়ী-জামা আমি পরে গিয়েছিলাম সে দুটো দোকানে ফেলে এসেছি। ব্যাগের ভেতর নেই।

হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রবিবাবু বললে, তাহলে তো এক্ষুণি আমাকে যেতে হয়। নইলে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

যাবার জন্যে রবিবাবু পা বাড়িয়েছিল? কাকীমা বললে, এই সব কিনে দিলি সুবীকে?

রবিবাবু বললে, হ্যাঁ কিনে দিলাম। ভাল হয়নি?

—কিন্তু ওই সব পরে ও রান্না করবে নাকি?

—রান্না ও আর করবে না।

—রান্না করবে না তো কী করবে?

কাকীমার কথাটার জবাব দিলে না রবিবাবু।

কাকাবাবু আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাসতে হাসতে বললে, এখান থেকে ওকে ও নিয়ে যাবে বলছে।

রবিবাবু ফিরে দাঁড়ালো। বললে, ছাখো অনিলদা, কেন নিয়ে যাব বলছি তা তুমি বেশ ভাল করেই জানো। লোভ সম্বরণ করা বড় শক্ত।

এই বলে সে একটা ট্যাক্সি ধরবার জন্যে তাড়াতাড়ি ছুটলো।

আর বেশি কিছু বলবার দরকার ছিল না। কাকীমা তার স্বামীটিকে বেশ ভাল করেই চেনে। কাকাবাবুর দিকে ফিরে কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল। দেখলে কাকাবাবু নেই।

—কোথায় গেলে তুমি? পালিয়ে গেলে কেন?

—পালাইনি। বলে কাকাবাবু ফিরে এলো। কাকাবাবুর হাতে একটা ছড়ি। বোধ করি সে ছড়িটাই আনতে গিয়েছিল।

সেই ছড়ি দিয়ে আমার পিঠে বুকে সপাসপ মারতে মারতে কাকাবাবু চীৎকার করে বলতে লাগলো—রবিকে তুই কী বলেছিস? আমার নামে কী বলেছিস?

দু'হাত বাড়িয়ে ছড়িটাকে ধরতে গেলাম পারলাম, না। ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইলাম ঘর থেকে। দোরের কাছে কাকীমা দাঁড়িয়ে। প্রাণপণে মারলে এক লাথি। উল্টে পড়ে গেলাম সেইখানে।

—বেশ্যা হারামজাদী, বেরো তুই আমার বাড়ী থেকে।

উঠতে যাচ্ছিলাম মেঝে থেকে, নতুন শাড়ীর আঁচলটা ধরে টেনে আমাকে একেবারে বেআব্রু করে দিলে কাকাবাবু।

কাকীমাকে বললে, সরো তুমি এখান থেকে। আমি ওর মিছে কথা বলা বের করছি।

এই বলে কাকাবাবু ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল আমার ওপর। কাকীমা বললে, না, কিছু করতে হবে না। ওকে ছেড়ে দাও। যাবেই যখন, ও এক্ষুণি চলে যাক রবির সঙ্গে।

কাকীমা তখন আমার ব্যাগটা বাগাবার জন্যে ব্যস্ত। ব্যাগের ভেতর চারখানা নতুন শাড়ী। ভারি লোভ লেগেছে তার।

ব্যাগটা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে বললে, এ সব কিচ্ছু দেবো না তোকে আমি। ওই এক কাপড়ে বেরিয়ে যা তুই এখান থেকে।

সেখান থেকে উঠে কাপড়-চোপড় সামলে তখন আমি বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। নিরুপায় কাকাবাবু আর-একবার তার হাতের ছড়িটা চালিয়ে দিলে আমার পিঠের ওপর।

—রাস্তার গুণ্ডাগুলো খাক তোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

কাকীমা বললে, ছুঁচসুতো থেকে মাথার চিরুনীটি পর্যন্ত কিনিয়েছে ও রবিকে দিয়ে। বলেছে হয়ত আমি কিছু দিই না ওকে।

মার খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম একা।

সদর দরজাটা বন্ধ করে দেবার শব্দ পেলাম। কাকীমা তখনও চেঁচাচ্ছে—ভেবেছে রবির সঙ্গে খুব সুখে থাকবে। রবির অমন জোয়ান সুন্দরী বৌ তোকে থাকতে দেবে কেন লা!

কলকাতার রাস্তায় তখনও ট্রাম চলছে। দোকানটা আমি চিনি। হাতে একটি পয়সা নেই। যাবই বা কেমন করে? রবিবাবু এক্ষুণি ফিরে আসবে। কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে থাকাই ভালো।

বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো না। যে ট্যাক্সিতে গিয়েছিল সেই ট্যাক্সিতেই ফিরে এসেছে রবিবাবু। কাগজের মোড়কটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে, এই নাও তোমার কাপড়-জামা। কিন্তু এখানে এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন?

বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললাম। সবই শুনলে সে। বললে, পরোপকার করার বিপদ ছাখো। ঠিক আছে। তুমি দাঁড়াও এইখানে। ট্যাক্সিটাও রইলো। আমি আসছি।

রবিবাবু গেল, আবার ফিরেও এলো।

একা আসেনি, পিছু পিছু এসেছে কাকামা—আমার সেই ব্যাগটা হাতে নিয়ে। রবিবাবুর হাতে তার নিজের ব্যাগ।

কাকীমার মত এরকম নির্লজ্জ মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। শুধু

নির্লজ্জ নয়. মিথ্যা কথা এমন গড় গড় করে বলে যাবারও একটা অসাধারণ ক্ষমতার প্রয়োজন।

কাকীমা সেই ব্যাগটা আমার হাতের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, এই নে, তোর ব্যাগ নে। আমি কি তোর শাড়ীগুলো নিতে চেয়েছিলাম যে তুই হন হন করে পালিয়ে এলি? আয়—খাবি আয়. রবি, তুই একটু বল। বললেই আসবে।

রবিবাবু আমাকে কিছু বললে না। বললে তার মেজদিকে।

—ও থাকলে তোর একটু সুবিধে হয় আমি জানি। কিন্তু দু'দিন বাদে যে আগুন জ্বলবে তাকে তুই নেবাতে পারবি না মেজদি।

কাকীমা বললে, খুব পারবো। গুরুর বাপের কথা বলছিস তো? ও একটা ছুঁচো। ছাখ না ওকে কিরকম জব্দ করি।

গলির মুখে এসে দাঁড়িয়ে গুরু। ডাকলে, মা! তুমি এসো।

রবিবাবু বললে, যা মেজদি, তুই যা।

কাকীমা দেখলে রবি যা ভেবেছে তা সে করবেই। ব্যাগটা কিন্তু তখনও সে হাতছাড়া করতে পারছে না। বললে, এটার কি হবে?

রবিবাবু বললে, ওটা তুই নিয়ে যা। সুবর্ণাকে আবার কিনে দেবো।

কাকীমা বললে, তাহলে তোর চিরুনী-টিরুনীগুলো নিয়ে যা, আমি বের করে দিই।

এই বলে ব্যাগটা সে খুলতে যাচ্ছিল। পেছন থেকে গুরু আবার ডাকলে, মা।

রবিবাবু বললে, ওগুলোও তুই নে। তোর কাজে লাগবে। এসো সুবর্ণা, ওঠো।

ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরতেই উঠে বসলাম দু'জনে।

কাকীমা বললে, যাক বাবা—মাঝখান থেকে আমার লাভ হয়ে গেল।

ট্যাক্সির পেছনে কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখলাম—হাতের ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে কাকীমা চলে গেল তার বাড়ীর দিকে।

এই পর্যন্ত বলে স্বর্ণা থামলো। আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললে, এইবার লিখুন আপনার গল্প।

বললাম, এ তো গল্প হলো না।

স্বর্ণা বললে, সে তো আমি আগেই বলেছি। আমার পৃথিবী আর কতটুকু। নিতান্ত ছোট সেই পৃথিবীতে ক'জন মানুষের সঙ্গেই বা আমার পরিচয়!

বললাম, বুঝেছি। আসল কথাটাই আপনি বলতে চান না।

—কোন্‌টা আসল কথা?

বললাম, গল্পের হিরো চাই, হিরোইন্ চাই। হিরো হলেন রবিবাবু আর হিরোইন হলেন আপনি। যেই আপনাদের যোগাযোগ হলো আর বলছেন—'আমার গল্প ফুরলো নটে গাছটি মুড়লো'। তা কি কখনও হয়?

স্বর্ণা হেসে একেবারে লুটোপুটি! আমার স্ত্রীর গায়ে ঢলে ঢলে পড়ে আর তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে। বলে—শোনো, তোমার কত্তাটি কি বলে শোনো! আসল কথা হলো উনি শুনতে চান রবিবাবুর সঙ্গে কিরকম ফুর্তিটা আমি করলাম!

বললাম, ওইটিই তো আসল গল্প। পৃথিবীর যে কোনও সাহিত্যের গল্প আপনি পড়ে দেখুন। সবেতেই সেই একই কথা। সেই নায়ক-নায়িকার মিলন-বিরহের কাহিনী।

স্বর্ণার মুখের হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। চোখ দুটি বন্ধ করে কি যেন ভাবতে লাগলো। তারপর চোখ যখন খুললে, দেখলাম চোখ-

দুটি জলে টল্‌ টল্‌ করছে। গলার আওয়াজটাও কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল। বললে, খুলেই বলি তাহলে সব কথা। শুনুন।

সুবর্ণা তার শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ দুটি মুছে নিয়ে বললে, ট্যাক্সির ভেতর রবি আর আমি।

—এখন থেকে রবিই বলি, কারণ তাকে আমি রবি বলেই ডাকি আমার বয়েসী একটা অশিক্ষিতা মেয়ে যে-কথা ভাবতে পারে আমিও সেই কথাই ভাবছি। বিনা দোষে এত যে মার খেয়ে এলাম সেকথা তখন ভুলে গেছি। রবির গায়ে আমার গা ঠেকছে ভালই লাগছে।

রবি বললে, এখন তোমাকে নিয়ে আমি যাই কোথায়? কলকাতায় অবশ্য আমার জানাশোনা বন্ধু বান্ধব দু-চারজন আছে। তাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠলে তারা নিশ্চয়ই ভাববে তোমাকে নিয়ে আমি পালিয়ে এসেছি। ভাববে—আমি একটা দুশ্চরিত্র লম্পট। তোমাকেও ভাল চোখে দেখবে না। তার চেয়ে কোনও হোটেলে—

বলেই চুপ করে রইলো রবি।

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

রবি কোনও কথাই বললে না। ভাবলাম তা'হলে বুঝি আমরা কোনও হোটেলেই যাচ্ছি। ভালই হবে। একটা রাত্রি অন্তত আমরা একই ঘরে থাকবো দু'জনে। রবিকে ভাল করে চেনবার সুযোগ পাব।

ট্যাক্সি চলছিল বড় রাস্তা ধরে। বাইরের দিকে তাকিয়ে রবি হঠাৎ বলে বসলো, থামো।

ট্যাক্সি দাঁড়াতেই রবি আমাকে বললে, নেমে এসো।

রাস্তার ধারে দোতলার বারান্দায় যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন।

তবে যে সেদিন বললি বাড়ী চলে যাবি ? বলতে বলতে এদিকে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ালেন তিনি।

রবি বললে, বাড়ী যাওয়া হলো না।

রবির সমবয়সী বন্ধু। দোরে ডোরপ্লেট দেখে এলাম—সমর রায়। এম-বি—ডাক্তার।

সমরবাবু আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন ঘন ঘন। ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে সোজা আমাকেই জিজ্ঞাসা করে বসলেন—কলকাতা দেখা হলো ?

কি জবাব দেবো বুঝতে পারলাম না। তাকালাম রবির দিকে। রবি বললে, তুই বুঝি ওকে আমার স্ত্রী ভেবেছিস ?

—স্ত্রী নয় ?

—না

—কে তবে ? বোন ?

রবি বললে, যা ভাবিস তাই! আপাততঃ আমাদের খাবার ব্যবস্থা কর! সন্ধ্যে থেকে ঘুরে বেড়িয়েছি শুধু। খাওয়া হয়নি।

খাবার ব্যবস্থা হলো। সমরবাবুর স্ত্রী, ছোট ছোট দুটি ছেলে। ছোট বোন একটি। বোনের এখনও বিয়ে হয়নি। কলেজে পড়ে! বেশ সুখের সংসার।

রাত্রে শোবার ব্যবস্থা হলো সমরবাবুর অবিবাহিতা সেই বোনের ঘরে। ভেবেছিলাম ভাল একটি সঙ্গিনী পাওয়া গেল। কিন্তু যে-মেয়ে বি-এ পড়ে, যার দাদা একজন এমবি ডাক্তার, সে-মেয়ে আমার মত ইস্কুলে-পড়া একটা মেয়ের সঙ্গে কথাই-বা বলবে কেন, ভাবই বা করবে কেন—

দাদাটি কিন্তু তার অন্যরকম মানুষ। আমায় সম্বন্ধে কতখানি কি শুনেছে রবির কাছে জানি না। পরের দিন আমাকে ডেকে বললে,

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র—এই কথাই তো আমার জানা ছিল। তোমার তো পরাজয় হবার কথা নয়।

ববি বললে, তোর ও দর্শন-শাস্ত্র ও বুঝবে না সমর। ওর কী ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি তাই বল।

সমর বললে, তোর যদি একটা বৌ না থাকতো তা'হলে বলতাম তুই ওকে বিয়ে কর।

ববি খুশী হলো না কথাটা শুনে। বললে. নিতান্ত সাধারণ কথা। সুন্দর দেহ দেখলেই তাকে উপভোগ করবার বাসনা।

সমর হাসতে লাগলো।—হাসতে হাসতে বললে, কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ করবে নাকি? পরমহংসদেব বলেছেন, বই-এ লেখা আছে, আমরা পড়েছি, মুখে বলেছি, কিন্তু কাজে কতখানি করতে পেরেছি জানি না যাক্‌গে শোন্‌, আমার কাজ আছে। তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে। তুই কি এই বোঝাটিকে কাঁধ থেকে নামাতে চাস?

—হ্যাঁ, তাই চাই।

সমর চট্‌ করে কি যেন ভেবে নিলে। ভেবে নিয়েই বললে, খেয়ে-দেয়ে চল্‌ তোরা দু'জনেই বেরিয়ে পড়্‌ আমার সঙ্গে।

একদিনে হলো না। তিন চারদিন লাগলো।

সমর আমার নার্সিং শেখাবার ব্যবস্থা করে দিলে। বললে, এই সেবাধর্মই হলো সবচেয়ে বড় ধর্ম। তোমাকে সেবিকা হতে হবে।

জানি। সেবিকা হয়েই আমি জন্মগ্রহণ করেছি। সেবা করবার জন্যই আমার সমস্ত মনপ্রাণ উৎসুক হয়ে আছে।

কিন্তু কার সেবা করবো ?

আমাকে নার্সদের বোর্ডিং-এ রেখে রবি চলে যাবে বহরমপুরে। রবিবার বিকেলে মেট্রনের কাছে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে এলাম বোর্ডিং থেকে। রবি মোটর নিয়ে দাঁড়িয়েছিল গেটের সামনে।

গড়ের মাঠের একটি নির্জন জায়গায় গিয়ে বসলাম দু'জনে।

রবি বললে, বেশ মন দিয়ে কাজটা শিখে নাও।

তারপর ?

কারও মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে না।

আপনারও মুখ চেয়ে বসে থাকবো না ?

না।

আপনি তাইতেই খুশী ?

খুশী হব না ? যা ভয় আমার হয়েছিল! ভেবেছিলাম বুঝি-বা আমার বাড়ী পর্যন্ত তোমাকে নিয়ে যেতে হয়!

নিয়ে গেলে কি হতো ?

রবি আমার মুখের পানে তাকিয়ে হাসতে লাগলো। কি সুন্দর সে হাসি! মনে হলো এই হাসিটুকুর জন্যে এই মানুষটিকে আমি আমার সব-কিছু দিয়ে দিতে পারি!

তখন আমার বুদ্ধি ছিল কম। জীবনের অভিজ্ঞতা তো একরকম ছিল না বললেই হয়। পুরুষের প্রতি আকর্ষণ ছিল দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভালবাসার মর্ম ঠিক বুঝতাম না। দেহকে অতিক্রম করে সে যে মনকে স্পর্শ করতে পারে, অপূর্ব এক আনন্দের অনুভূতিতে সমস্ত অন্তর যে ভরে যায়—সেদিন আমি তা প্রথম অনুভব করলাম।

যে কথাটা হচ্ছিল তার শেষই হারিয়ে গেল! আমাকে দেখেই রবি হাসছে নিশ্চয়ই। এ হাসি তার আনন্দের হাসি—তৃপ্তির হাসি।

সবাই বলে বলে মনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ধরিয়ে দিয়েছে যে, আমি অপরূপ সুন্দরী। সেই সৌন্দর্যের গর্বে আর অহঙ্কারে আমি তখন আত্মহারা। মাটিতে পা পড়ে না বললেও ভুল বলা হয় না।

ভেবেছিলাম, আদর করে রবি আমাকে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু কিছুই সে করলে না দেখে আমিই তার হাতখানা টেনে নিলাম।

হাতখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, রবি বললে, হাত দেখতে জানো নাকি ?

ছেড়ে দিলাম হাতখানা।

বাস্, রবি তার পকেটে হাত দিয়ে পঞ্চাশটি টাকা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললে, এই টাকাটা রাখো। যখন যা দরকার হবে কিনে নিও।

বললাম, সবই তো কিনে দিয়েছেন, কিছুই দরকার হবে না

রবি বললে, দরকার হতেও তো পারে!

এই বলে জোর করে নোটগুলি আমার হাতে দিয়ে রবি উঠে দাঁড়ালো। বললে, চল।

মনে হলো নোটগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিই। কিন্তু না পারলাম নোট-গুলো ছুঁড়ে ফেলতে, না পারলাম কোনও কথা বলতে, ধীরে ধীরে তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম।

—আপনি কি কালই বহরমপুর চলে যাবেন?

রবি বললে, কী দরকার আমার আর এখানে থাকবার ?

কি জবাব দেবো বুঝতে পারলাম না।

সত্যিই তো, তাঁর আর কী দরকার থাকতে পারে আমার সঙ্গে ? আমার বিপদ থেকে উদ্ধার করে তিনি আমাকে এক নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে দিলেন—আর কি প্রয়োজন থাকতে পারে আমার সঙ্গে ?

—আমার এই রূপ, এই যৌবন, এই দেহ—

এই পর্যন্ত বলেই সুবর্ণা আমার মুখের পানে তাকিয়ে চুপ করে রইলো।

বললাম, থামলেন কেন? বলুন!

এতক্ষণ পরে আমার স্ত্রী কথা বললে।

—বুঝতে পারছো না?

বললাম, না!

—এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গল্প লেখো? গল্প আর লিখো না। সব ভুল হয়ে যাবে।

এই বলে সে সুবর্ণার দিকে তাকিয়ে তাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, রবিবাবুর ছেলেপুলে আছে?

সুবর্ণা বললে, আছে। মাসতিনেক পরে আবার একদিন বিকেলে একটি 'স্লিপ্' পেলাম। রবি এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে হোস্টেল্স্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে ছুটি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দেখি—ট্যাক্সিতে বসে আছে রবির স্ত্রী আর একটি বছর-চারেকের বিবি ফুটফুটে ছেলে।

রবির স্ত্রী ভালবেসে আমাকে কাছে টেনে নিলে। ছেলেকে বললে, এ তোমার কে হয় বল তো খোকন?

খোকন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার মা তাকে শিখিয়ে দিলে—বলবি, রাঙা মাসি।

খোকন বললে, লাঙা মাচি।

ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। বুক আমার জুড়িয়ে গেল।

এর পরের কথা আর মুখে জানানো যায় না।

কলকাতায় ওরা এসে উঠেছিল একটি হোটেলে। রবির স্ত্রী রবিকে কাছে ডেকে বললে, তুমি তো ওর গার্জেন। তুমি ইচ্ছে করলে

সুবর্ণাকে নিয়ে যেতে পারো আমাদের হোটেলে। যে ক'দিন কলকাতায় থাকি ও থাক না আমাদের সঙ্গে।

রবি আমার মুখের দিকে তাকালে। অর্থাৎ আমার সম্মতি চাইলে।

সম্মতি আমি দিলাম না। মাথা নেড়ে বললাম, আমার পড়ার ক্ষতি হবে।

রবির স্ত্রী বললে, নার্সিং আবার পড়া, তার আবার ক্ষতি!

কার ক্ষতি এবং কিসের ক্ষতি সেকথা বুঝলে না বোকা মেয়ে।

গেলে বোধহয় মন্দ হতো না। কিন্তু কী যে দুর্জয় অভিমান হলো আমার, কিছুতেই আমি যেতে চাইলাম না।

রবি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সবই সে বুঝতে পারলে! স্ত্রী-পুত্র নিয়ে চলে গেল কলকাতা থেকে। বহরমপুর থেকে চিঠি লিখলে—কিছু-দিনের জন্য আমাকে বোম্বাই যেতে হচ্ছে! প্রয়োজন হলে হয়ত বা সেখান থেকে আমি বিলেতে যেতে পারি। যাবার আগে তোমাকে জানাবো। আর একটি কথা তোমাকে আমি না জানিয়ে পারছি না। ভাল এক ছেলের সন্ধানে আছি। তোমায় আমি বিয়ে দিতে চাই।

চিঠির জবাব লিখলাম—আপনার যেখানে খুশী আপনি সেখানে চলে যেতে পারেন। দোহাই আপনার—আপনি যেন আমার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন না। বিয়ে আমি করব না!

পৃথিবীতে একটি মাত্র পুরুষের সন্ধান আমি জানি—যার নাম রবি।

হ্যাঁ—হ্যাঁ—সন্তান আমি চেয়েছিলাম বই-কি! মেয়ে হয়ে জন্মেছি—সন্তান চাইবো না। সন্তান চেয়েছিলাম সংসার চেয়েছিলাম, স্বামী চেয়েছিলাম।

আমার স্বামী হবার যোগ্যতা কারও যদি থেকে থাকে তো তা আছে একমাত্র রবির।

সেই রবি পালিয়ে গেল আমার কাছ থেকে।

আমি ঠিক পাগলের মত হয়ে গেলাম। আমার দেহের সৌন্দর্য তাকে টানতে পারলো না কেন বুঝলাম না।

একে সে অপরাধ বলে মনে করেছে।

হয়ত বা ভেবেছে তার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

আমি কিন্তু তাকে ভালবেসে ফেললাম অন্ধের মত। বোকার মত।

কত হীরের টুকরো ডাক্তার-ছাত্র আমার পিছু নিলে। কত অনুনয়, কত মিনতি, কত প্রেমপত্র। কিন্তু সবাইকে প্রত্যাখ্যান করে আমি শুধু রবির আশায় বসে রইলাম।

পৃথিবীতে একটিমাত্র মেয়ে তার অমিত রূপ আর যৌবন নিয়ে পরাজয় স্বীকার করে নিল একটি পুরুষের কাছে - এই কাহিনী লেখা থাকবে মানুষের ইতিহাসে ? তা কখনও হতে দেবে না সুবর্ণা।

এই রকম একটা জেদ চড়ে বসলো আমার মনে। রবিকে চিঠি লিখে লিখে আনলাম এই কলকাতা শহরে। লড়াইটা হাতাহাতি হোক্। মুখোমুখি হোক্।

ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিল দেখা করতে। যেমন আসে ঠিক তেমনি করে। দেখা করে, হাসে, কথা বলে, কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, বড় জোর একটা সিনেমা দেখে আবার আমাকে বোর্ডিংএ ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যায়।

আমার তখন কোর্স শেষ হয়ে গেছে। খুব ভাল করে পাশ করেছি। তখন আমি যা খুশী তাই করতে পারি। হাসপাতালে থাকতেও পারি, না থাকলেও বাধা দেবার কেউ নেই।

রবিকে বললাম, এখন স্বাধীনভাবে আমাকে একটা বাড়ী ভাড়া করে দাও। আমি আমার কাজ আরম্ভ করি।

—এই জন্যে আমাকে এত করে ডেকে আনলে ?

সত্য কথা গোপন করলাম। বললাম, হ্যাঁ। এইবার তোমার শেষ কর্তব্য করে দাও।

রবিও তার কর্তব্য করলে। আমিও আমার কর্তব্য করলাম। তখনকার দিনে বাড়ী এমন দুর্লভ ছিল না।

রাস্তার ধারে ছোট্ট একখানি বাড়ী পাওয়া গেল। দুখানি মাত্র ঘর। স্বয়ংসম্পূর্ণ সুবর্ণার সংসার। বর্ষাকাল। মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ। মন্দ লাগছিল না।

নিজে রান্না করে রবিকে খাইয়েছি দিনের বেলা। খেয়েদেয়ে কোথায় যেন সে বেরিয়ে গিয়েছিল, ফিরলো সন্ধ্যায়। বললে, দেখতে এলাম তুমি কেমন আছ।

বললাম, ভালই আছি।

চলি তা'হলে। রাত্রে আমি হোটেলেই থাকবো। কাল সকালে এসে আবার দেখে যাব।

—অত দয়া নাই বা করলে !

এই প্রথম তাকে 'তুমি' বললাম।

রবি বললে, এক্ষুণি বৃষ্টি নামবে। ছাতি নেই।

বললাম, একটু বোসো। তোমার জন্যে ছাতি আমি কিনে এনে দিচ্ছি। এটা কলকাতা শহর। দোকানে ছাতি পাওয়া যায়।

রবি জিজ্ঞাসা করলে, ঝি কোথায় গেল ? সে তো রাত্রে থাকবে তোমার কাছে !

না, সে থাকতে পারবে না। তার মেয়ে রাজী হচ্ছে না।

ঝি কোথায় ?

বললাম, চলে গেছে। কাল আসবে।

রবিকে বসতে হলো।

ধর্মাধর্ম জ্ঞান, আপনারা যাকে বলেন হিতাহিত বোধ,—সবই তখন

আমার চলে গেছে। সব ধর্মের চেয়ে যে ধর্ম আমার কাছে সবচেয়ে প্রবল—মাতৃত্বের সেই বিপুল আকাঙ্খা—জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমার গণ্ডী—বাধা-নিষেধের বেড়া—সব কিছু তখন ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো। বিধাতা আমাদের সাহায্য করলেন। সারা পৃথিবী থেকে আমাদের দুটি প্রাণীকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে জীবনের অনির্বচনীয় আনন্দে হৃদয়ের দুটি পাত্রকে যেন কানায় কানায় পূর্ণ করে দিলেন। বুভুক্ষু ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা নিবৃত্তির দীনতা হয়ত ছিল, কিন্তু সে দীনতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল হৃদয়ের ঐশ্বর্যে।

নবযৌবনের বৃন্তপুটে মঞ্জরী ধরলো।

নার্সের সাইন্‌বোর্ডটা উল্‌টে পড়ে রইলো উঠোনের একপাশে। সেটা আর টাঙ্গানো হলো না।

সুবর্ণা আবার থামলো।

আবার আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললে, আর বলবো?

বললাম নিশ্চয়ই বলবেন।

সুবর্ণা বললে, যে কথা কাউকে বলিনি, সেই কথা শুনুন। এ আমার কলঙ্কের কাহিনী নয়। এ আমার পরিপূর্ণতার আনন্দের সংবাদ।

বললাম, কী সে সংবাদ শুনি!

সুবর্ণা বললে, আমার একটি ছেলে হলো, ভালবাসার সন্তান। রবির ছেলের নাম রাখলাম কবি।

জিজ্ঞাসা করলাম, সে ছেলে কোথায়?

সুবর্ণা বললে, আমার এক সহপাঠিনি বান্ধবীর কাছে। তারা কয়েকজনে মিলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটি নার্সারী স্কুল করেছে। সেইখানেই মানুষ হচ্ছে। আমি সপ্তাহে একবার করে যাই, দেখে আসি, টাকা দিয়ে আসি।

—নিজের কাছে রাখলেন না কেন?

—ছেলে নিয়ে নার্সের কাজ করা চলে না। তাছাড়া ছেলেকে মানুষ করতে হবে। টাকার দরকার।

—কেন? ছেলের বাপ্ কি করছে? রবি? রবির নাম শুনে সুবর্ণার মুখখানা অন্যরকম হয়ে গেল। বললে, রবির নাম আর করবেন না। রবি আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়েই থাক্।

—রাগ করেছেন তার ওপর?

সুবর্ণা বললে, না, রাগও করিনি, অভিমানও করিনি। মানুষকে চিনতে পারলাম না—এই আমার বড় দুঃখ।

—রবিকেও চিনতে পারলেন না?

সুবর্ণা বললে, না। এই কথা বলে যে কথাটা সুবর্ণা বলতে চাইলো মনে হলো সে কথাটা বলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। ঠোঁট দুটি তার থর থর করে কাঁপতে লাগলো, বড় বড় সুন্দর চোখদুটি তার জলে ভরে এলো। তবু বললে—

ছেলের বাপের নাম বলেছিলাম—রবীন্দ্রনাথ সরকার—রবি অস্বীকার করলে। বললে, না। ও ছেলে আমার নয়। আমি ওর বাপ নই।

এই কথা শোনবার পর আমার মুখ দিয়ে আর কথা বের হলো না। আমি যেন বোবা হয়ে গেলাম। আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। সারা পৃথিবীর রং গেল বদলে।

পিতৃ পরিচয়হীন নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক সেই অবোধ শিশু মানুষ হচ্ছে আমার এক বন্ধুর কাছে। আর তার কলঙ্কিনী মা কুমারী সুবর্ণা সরকার নার্সের কাজ করছে—যেখান থেকে আমাকে নিয়ে এলেন সেই বাড়ীতে।

এই বলে সে আমার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

সুবর্ণা সরকারের সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল আমার।

সুবর্ণার মত মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। অনেক গল্প সে আমাকে বলেছে।

কত ছেলের গল্প, কত মেয়ের গল্প।

এমন অনেক মেয়ের কথা সে আমাকে বলেছে যাদের কথা শুনে শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে আমার মাথা নত হয়ে গেছে।

ছেলেদের কথাও সে কম বলেনি।

বলেছে, 'পুরুষদের কথা আমার মুখ থেকে নাই বা শুনলেন!'

আমি বলেছি, 'কেন, শুনতে দোষ কি?'

সুবর্ণা বলেছে, 'দোষ কিছু নেই। তবে রবি আমাকে যে আঘাত দিয়েছে সে আঘাতের বেদনা আমার সমস্ত দেহমনকে জর্জরিত করে রেখেছে। সেটাকে তো ভুলতে পারবো না, তাই ভয় হয়—পুরুষদের কথা বলতে বলতে গিয়ে আবার সেই রাগ যদি পুরুষদের ওপর গিয়ে পড়ে তাহ'লে হয়ত অবিচার করবো।'

কিন্তু আশ্চর্য্য সুবর্ণার মন।

অবিচার সে করেনি।

ঠিক তার বিপরীত চরিত্রের এমন একটি যুবকের কথা সে আমাকে বলেছে যার উদারতার কথা শুনে আনন্দই হয়।

সেই গল্পটিই আপনাদের শোনাব।

সুবর্ণা বলেছিল, আপনি নিজেও তো গল্প লেখেন, মানুষের জীবন আর চরিত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, আপনি কি দেখলেন?'

জবাবে বলেছিলাম, এই পৃথিবী আনন্দময়, জীবনও আনন্দসন্ধানী। যে মানুষ সহজভাবে জীবনকে গ্রহণ করে সে আনন্দ পায়। আর যে মানুষ বাঁকা পথ ধরে সে তার জীবনকে নানান্ জটিলতায় জড়িয়ে সারা জীবন শুধু কেঁদেই মরে।'

হো'হো করে হেসেছিল সুবর্ণা। সে বড় সুন্দর হাসি। বড় পবিত্র, বড় নির্মল হাসি।

হেসে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, 'যাক্, শুনুন তাহ'লে আর একটি গল্প। সেই-যে বাড়ীটার কথা আপনাকে বললাম যে বাড়ীটা থেকে আমি মার খেয়ে রবিবাবুর সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলাম, সেই বাড়ীর কথা একটুখানি বলা হয়নি, সেটা শুনুন।

গুরুচরণ ছেলেটা তখন ইস্কুলে পড়ে। বাড়ীতে বাপ আর মা। মা'র এক গুরুদেব ছিলেন। প্রায়ই এই বাড়ীতে আসেন, মাসাবধিকাল থাকেন তারপর হঠাৎ একদিন চলে যান।

গুরুচরণের মা'র ধারণা এই গুরুদেবের কৃপায় তার ছেলে হয়েছে। তাই সে তার ছেলের নাম রেখেছে গুরুচরণ।

স্বামীর কিন্তু গুরু-টুরুতে বিশ্বাস নেই। গুরুদেবকে সে ভাল চোখে দেখে না। পাঁড় মাতাল। রোজ সন্ধ্যেবেলা আফিস-ফেরতা মদ খেয়ে বাড়ী ঢোকে।

বাড়ীতে ঢোকবার আগে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে স্ত্রীকে বলে, 'আছে নাকি তোমার গুরুদেব? থাকে তো বল—আমি পালাই।

স্ত্রী বলে, 'পালিয়ে—যাবে কোন্ চুলোয়?'

স্বামী বলে, 'দাড়ি রাখেগা। দাড়ি রাখকে সন্ন্যাসী বন্ যায়েগা।'

কথাগুলো সে যে তার গুরুদেবকে লক্ষ্য করে বলছে সেকথা বুঝতে তার দেরি হয় না। স্ত্রী তেড়ে মারতে আসে। দুজনে কুরুক্ষেত্র বেধে যায়।

স্ত্রী বলে, 'লজ্জাও করে না? ছেলে পড়ছে—শুনতে পাচ্ছ না?'

'খুব শুনতে পাচ্ছি।'

পাড়া মাথায় করে গুরুচরণ তখন একই কথা বার বার উচ্চারণ করে করে পড়া মুখস্থ করছে।

'ভারতবর্ষের-ভারতবর্ষের-ভারতবর্ষের, সভ্যতা-সভ্যতা-সভ্যতা-সভ্যতা সভ্যতা, অতি-অতি-অতি-অতি প্রা-চীন, প্রাচীন প্রাচীন। ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি প্রাচীন।

বাপও তেমনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'সভ্যতা বলিস্‌নে, বল অসভ্যতা। বল্‌—ভারতবর্ষের অসভ্যতা অতি প্রাচীন।'

ছেলেও তেমনি। পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য ভেবে বলতে যাচ্ছিল—ভারতবর্ষের অসভ্যতা—

মা তেড়ে না উঠলে কি হতো বলা যায় না। ছেলের কাছে গিয়ে বললে—

—খবরদার বলছি গুরো, তার বাপের কথা শুনবি না। আর তোমাকে বলছি, দোহাই তোমার, একে তো ওই ছেলে তোমার এক কেলাসে দু-বছর ধরে রগড়াচ্ছে, তার ওপর এবারে আর ফেল্‌ করিয়ে দিও না।

সুবর্ণা বললে, সেই এক ক্লাসে দু-বছর রগড়ানো ছেলে গুরুচরণের সঙ্গে আমার আবার দেখা হলো অনেকদিন পরে।

দেখা হওয়াটাও সে এক বিচিত্র ব্যাপার।

আমি তখন রীতিমত নার্স হয়ে স্বাধীনভাবে প্র্যাক্‌টিস করছি।

মস্ত বড় একটা বাড়ীর দোতলায় দু'খানা ঘর নিয়ে থাকি। নিজেই রান্নাবান্না করে খাই। 'কল্‌' পেলে কাজে বেরিয়ে যাই।

ডাক্তার বোসের একটি রুগী পেয়েছিলাম। রুগী না বলে রুগিনী বললেই ভাল হয়। ছেলেমেয়ে নাতি-নাৎনী নিয়ে বিরাট সংসার। গিন্নিবান্নী মানুষ। ডাক্তার বোস বলে দিয়েছিলেন, হাই ব্লাড-প্রেসারের রুগী। দেখবেন যেন বেশি চেঁচামেচি না করেন।

অথচ এই চেঁচানোটাই তাঁর রোগ। সারা বাড়ী তাঁর ভয়ে অস্থির। কারও এতটুকু ভুলচুক হবার উপায় নেই। কেউ কিছু করেছে কি অমনি তেড়ে তাকে মারতে আসেন।

রোজ সকালে একবার করে আমাকে সেখানে যেতে হয়। রাত্রে

কেমন ছিলেন তার রিপোর্টটা নিয়ে চলে আসি। আবার যেতে হয় বিকেলে। তখন ডাক্তার বোস আসেন।

সেদিন সকালে গিয়েছি। সিঁড়িতে পা দিতেই শুনি কাকে যেন খুব বকছেন গিন্নি-মা।

—বেরিয়ে যাও তুমি, বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে! চোর আমি রাখতে পারবো না বাড়ীতে।

দোতলায় উঠতেই তাঁর ছোট বো-এর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করলাম, শাশুড়ীঠাকরুণ চেঁচাচ্ছেন কেন? কে কি চুরি করেছে?

ছোট বো ঠোঁট উল্‌টে বললে, মায়ের কথা আর বলবেন না। চুরি কেন করবে? ছেলেটা বাজার করতে গিয়েছিল—পাঁচটা নয়া পয়সার হিসেব মেলাতে পারছে না।

ভেবেছিলাম বুঝি চাকর কিন্তু গিয়ে দেখি—যে-ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে সে চাকর নয়। একই ক্লাসে দু'বছর রগ্‌ড়ানো সেই আমাদের 'ভারতবর্ষের সভ্যতা'—গুরুচরণ।

জিজ্ঞাসা করলাম, গুরু! তুই এখানে এলি কেমন করে?

গুরুচরণ জবাব দেবার আগেই গিন্নি-মা বললেন, তুমি চেনো নাকি ছোঁড়াকে?

বললাম, চিনি। ও এখানে এলো কেমন করে?

—আমাদের কত্তাটি—বুড়ো মিন্‌ষের খেয়েদেয়ে তো কোনও কাজ নেই, রাস্তা থেকে ওই জঞ্জাল কুড়িয়ে এনেছে। বলে কিনা মা নেই বাপ্ নেই—থাকবার একটুখানি জায়গা আর দুবেলা দুটি খেতে পেলে ওর কলেজে পড়া হয়। তা আমি বলি কি, দু'বেলা পিণ্ডি গিলছো যখন, বাড়ীর বাজারটা করে দাও।

বললাম, তা বেশ তো, আপনি চেঁচাচ্ছেন কেন?

কথাটা শোনবামাত্র তিনি আবার চেঁচিয়ে উঠলেন।

বেশ করবো, চেঁচাবো। তোমাকে মধ্যস্থতা করতে কেউ ডাকেনি।

বললাম, চেঁচালে যে আপনার প্রেসার বাড়বে।

—প্রেসার বাড়বে তো তোমরা রয়েছ কি জন্যে? তোমরা তো আর মাগ্‌না আসছো না। দুবেলা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিচ্ছি দু'জনকে।

ভদ্রমহিলার কথাবার্তার ধরনই এইরকম।

তাঁকে ছেড়ে দিয়ে গুরুচরণকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে যা শুনলাম—তা আমি কোনদিন শুনবো ভাবিনি।

তার মা নাকি তার বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে গুরুদেবের আশ্রমে চলে গেছে। বাপও চলে গেছে সন্ন্যাসী হয়ে। গুরুচরণ ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে সবে তখন কলেজে ভর্তি হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোর সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থাই করে যায়নি তারা?

গুরুচরণ বললে, না।

—তোর মায়ের গুরুদেবের আশ্রমটা কোথায়?

—জানি না।

—তোর বাপ কোথায় গেল তাও জানিস না?

—না।

আশ্চর্য! একটা ছেলের জন্যে কত মেয়েকে আমি কত অসাধ্য সাধন করতে দেখেছি। আবার এই কলেজে পড়া ছেলেটাকে একেবারে অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে এমন নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াতে পারে—এই-বা কেমন মা?

বাপটা না হয় মাতাল বজ্জাত—তার পক্ষে সবই সম্ভব।

কিন্তু অতবড় ছেলের মায়ের কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না কিছুতেই।

সে যাই হোক, গুরুচরণদের বাড়ীতে আমি অনেকদিন অন্ন গ্রহণ করেছি। সেদিক দিয়ে একটা ঋণ ছিল আমার। সে ঋণ পরিশোধ করবার এইটেই উপযুক্ত সুযোগ ভেবে গুরুচরণকে বললাম, তুই চল্‌ আমার সঙ্গে। এখানে আর থাকতে হবে না।

গুরুচরণকে আমি সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমারই কাছে থাকবে, খাবে আর কলেজে পড়বে।

এইবার আর-একটা মায়ের কথা বলি।

গুরুচরণকে তো নিয়ে এলাম আমার বাড়ীতে।

যে-বাড়ীতে থাকি, অনেকদিনের পুরনো পড়ো বাড়ীর মস্ত বড় বাড়ী। তারই দোতলায় একটেরে দু'খানা মাত্র ঘর। রংস্তার দিকের বারান্দায় আমার সাইনবোর্ডটা টাঙিয়ে দিয়েছি। রান্নাঘরটা একটু দূরে। সিঁড়ির পেছন দিকে টিনের একখানা ঘরে রান্না করতে হয়। তা হোক্। আমার অসুবিধা বিশেষ কিছু হয় না। সেখানে কতক্ষণই বা থাকি। গুরুচরণ কলেজে যায়। তারই টানে টানে আমাকেও সকাল-সকাল রান্না করে খেয়ে নিতে হয়। তারপর রাত্রের খাবার।

বিকেলে যেদিন ডিউটি পড়ে, সেদিন হয় মুস্কিল।

মুস্কিল হতো না—বাড়ীটায় যদি ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা থাকতো। একদিন হয়ত ছিল, এখন নেই। দেয়ালের গায়ে আলোর তার রয়েছে, কিন্তু আলো জ্বলে না। দুটো লণ্ঠন কিনেছি। একটায় গুরুচরণ পড়ে। আর একটা নিয়ে আমি রান্নাঘরে গিয়ে কাজ করি।

রান্নাঘরের পাশেই মস্ত বড় একটা গাছের ডাল এসে পড়েছে ছাতের ওপর। অন্ধকার রাত্রে ঝড়ো হাওয়ায় যখন গাছের পাতাগুলো নড়ে, তখন গা ছম্ ছম্ করে।

গুরুচরণকে বলি, তুই জোরে জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়, আমি রুটিগুলো সেঁকে নিই।

গুরুচরণ বলে, চল না আমি রান্নাঘরে বসে বসে পড়ি।

বলি, না, তোকে রান্নাঘরে যেতে হবে না।

একদিন হলো বিপদ।

রাত্রে ডিউটি পড়লো। বেয়াড়া রুগী নিয়ে সারারাত একরকম জেগেই কাটাতে হলো। ভোরে বাড়ী ফিরেই উনোনে আগুন দিলাম। গুরুচরণকে কলেজের ভাত দিতে হবে।

স্নান করে রান্নাঘরে যখন গেলাম, কখন আমার চোখ দুটো ঘেমু জড়িয়ে আসছে।

একা হলে সেদিন আর রান্না করতাম না। দোকান থেকে কিছু খেয়ে নিতাম। কিন্তু তা আর হোল না। পুড়ে মরতে মরতে রান্না করতে হলো।

অথচ রাত্রের ডিউটি ছাড়া যায় না। টাকা বেশি পাই।

পরের দিন ডিউটিতে যাচ্ছি, পথে রুমার সঙ্গে দেখা। এক সঙ্গে নার্সিং শিখেছি আমরা। রিক্সায় চড়ে সে একটা 'কলে' যাচ্ছিল। কয়েকজন বন্ধু মিলে তারা একটি 'ইউনিয়ন' করেছে। আমার সঙ্গে দেখা হলেই রুমা আমাকে তাদের দলে টানতে চায়। আমাকে দেখেই রুমা নামলো 'রিক্সা' থেকে। তার সেই এক কথা।

—এ মাসে খুব ভাল 'শেয়ার' পেয়েছি আমরা। তুই আয় না আমাদের ওখানে।

বললাম, আমার যাবার উপায় নেই ভাই। তার চেয়ে তুমি বরং আমার একটি উপকার কর। যে বামুনের মেয়েটি তোদের রান্না করে দেয়, তাকে বলে ছাখ্‌ যদি একটি মেয়ে পাস। আমার রান্না করে দেবে। ভাল মাইনে দেবো।

রুমা হেসে বললে, আমাকেই রাখ না ভাই। কাউকে বলবো না আমি—চোখ বুজে থাকবো।

সবাই ভাবে বুঝি আমার একা থাকার পেছনে কিছু রহস্য আছে।

দিন-চারেক পরে একদিন সকালে রোগা ছিপছিপে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে এসে দাঁড়ালো আমার কাছে। শতরঞ্চিতে জড়ানো একটি বালিশ আর ছোট্ট একটি টিনের বাক্স নামিয়ে গড় হয়ে একটি প্রণাম করলে আগে, তারপর আঁচলের খুঁট থেকে একখানি চিঠি বের করে আমার হাতের কাছে বাড়িয়ে ধরে বললে, ছাখো দেখি মা, ঠিক জায়গায় এয়েছি কিনা!

চিঠিখানি লিখেছে রুমা। লিখেছে—এই মেয়েটি তোমার রান্না করে দেব। এর কেউ কোথাও নেই। দেশ থেকে সবে এসেছে কলকাতায়। তোমারই ওখানে খাবে থাকবে। মাইনে কত নেবে তুমি ঠিক করে নিও।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এত রোগা কেন? অসুখ-বিসুখ কিছু আছে নাকি?

খানিকটা জিব বের করে মেয়েটি বললে, হেই মা, এ কি কথা বলছেন তুমি? মা-কালীর দিব্যি করে বলছি—অসুখ-বিসুখ কিছু নেই। পেট ভরে দুবেলা খেতে পাইনি মা, তাই রোগা হয়ে গেছি।

—তোমার নাম কি?

—আমার নাম? আমার নাম রাধা।

—তুমি রান্না করতে পারবে তো?

—হেই মা, এ কি কথা বলছেন গো? মেয়েমানুষ—রান্না করতে জানবো না? রান্না করতে জানি। গান গাইতে জানি।

—গান গাইতে জানো?

রাধা বললে, হ্যাঁ গো, বোষ্টমের মেয়ে? বাবা একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করতো। আমাকেও গান শিখিয়েছিল। তারপর বাবাকে একদিন গোখ্‌রা সাপে দংসন করলো।—কত রোজা এলো, কত কি করলে, কিছুতেই বাঁচাতে পারলে না—মরে গেল।

গাঁয়ের লোক বললে—যা তুই কলকাতা চলে যা। আমাদের গাঁয়ের দু'জন থাকে এখানে। মরিদিদি আর সুধাদিদি। তাদের কাছেই এলাম। তারা আমাকে এক মাস রাখলে। এখান ওখান চাকরির চেষ্টা করলে, চাকরি কোথাও হলো না। তারপর এইখানে এসেছি। তুমি যেন আমাকে তাড়িয়ে দিও না মা। আমি খুব ভাল মেয়ে—তুমি রাখলেই বুঝতে পারবে।

বলতে বলতে মেয়েটার চোখ দুটি জলে ভরে এলো।

বললাম, কেঁদো না, তুমি থাকো।

মাইনের কথাটা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম। বললাম, মাইনে কত নেবে কই বললে না তো ?

চোখের জল মুছে রাধা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে। বললে, খেতে দেবে, পরতে দেবে, থাকতে দেবে, আবার মাইনেও দেবে ? সত্যি বলছি তুমি খুব ভাল মেয়ে। তোমার এইখানে চিরজীবন থাকবো, এই তিন সত্যি করছি। থাকবো, থাকবো, থাকবো। —মাইনে তুমি যা দেবে তাই দেবে। সবই জমা থাকবে তোমার কাছে। নাও এবার কি করতে হবে বল। আমি এক বাটি চা খাব কিন্তু।

সেদিন ছিল রবিবার। গুরুচরণের কলেজ নেই। আমারও কোনও কাজ ছিল না। দেরি করে রান্না চড়াবো ভেবে উনোনে আগুন দিয়ে গুরুচরণকে বাজরে পাঠিয়েছিলাম।

বেশ তবে চা দিয়েই তোমার কাজ আরম্ভ হোক।

উনোন ধরে গিয়েছিল। চায়ের সরঞ্জাম দেখিয়ে দিলাম। পরিপাটি করে চা তৈরি করে রাধা প্রথমেই এক পেয়ালা চা নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো।

গুরুচরণ এলো বাজারের থলে হাতে নিয়ে।

রাধা জিজ্ঞাসা করলে, এটি আবার কে গো ? ছেলে নাকি ?

বললাম, না ছেলে নয়। ভাই। ওকে তুমি দাদা বলবে।

অপরিচয়ের বাধা নেই রাধার। তক্ষুনি জিজ্ঞাসা করে বসলো, কি গো দাদা, চা খাবে নাকি?

গুরুচরণ বললে, দাও।

রাধা গুরুচরণকে চা খাওয়ালে, নিজে খেলে।

তারপর বাজারের থলে নিয়ে মাছ কুটতে বসলো।

মাছ কুটছে আর গান গাইছে—

ও সজনী দিনরজনী কি যে ভাবি

কিছুই জানি না

বাইরে যে তা বাইরে থাকে

ঘরকে আনি না॥

গলায় সুর আছে মেয়েটার।

দিব্যি হাসিখুশী ভাব। মন্দ লাগছে না। মনে হলো যেন রান্নার হাঙ্গামা থেকে বাঁচলাম।

মাছ কোটা শেষ হলে বললে, এখানে বেড়াল নেই তো?

বললাম, আছে। একটা হুলো বিড়াল হরদম ঘুরে বেড়ায়।

—তাহলে ঢাকাঢুকি দিয়ে আমি চান করে আসি। কে কি খেতে ভালোবাসো আমাকে বলে দেবে গো মা, আমি সব রকম রাঁধতে জানি।

খেতে বসে দেখি সবতেই নূন কম।

—এ কি রে রাধা, নূন দিস্‌নি যে?

রাধা বললে, দিয়েছি গো মা, তবে একটু ভয়ে ভয়ে দিয়েছি। বেশি নূন দিয়ে ফেললে তো মুখে দিতে পারতে না। এ বরং একটু দিয়ে নিলেই চলবে।

অবেলায় খেয়েছি। রাত্রের রান্না করতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে রাধা গেছে রান্নাঘরে। আমার ঘরে সেজ্‌বাতিটা জ্বালিয়ে বালিশের একটা ওয়াড় সেলাই করছিলাম।

হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার শুনে চমকে উঠলাম। মুখ তুলে তাকিয়েই দেখি—লণ্ঠন হাতে নিয়ে রাধা ছুটতে ছুটতে এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো আমার পায়ের কাছে।

বেকায়দায় পড়লে তার কি যে হতো বলা যায় না। হাতের লণ্ঠনটা দূরে ছিটকে পড়েছিল। হাত দিয়ে তুলতেই দপ্ দপ্ করে নিবে গেল। রাধা তখনও কথা বলতে পারছে না। শুধু গোঁ গোঁ করছে আর হাতের ইসারায় বাইরেটা দেখিয়ে দিচ্ছে।

—কি হয়েছে বলবি তো! কী ওখানে?

রাধা উঠে বসেছে। এতক্ষণে মনে হলো যেন তার জ্ঞান ফিরলো। বললে, ভূত?

—কোথায় ভূত?

অন্ধকার ছাতের ওপর গাছের সেই ঝোঁপ-ঝোঁপ ডালটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওইখানে।

বুঝলাম সেই গাছটাকে দেখে ভয় সে পেয়েছে। ভয় পাবার কথাই। আমারও গা ছম্ ছম্ করে। তবু তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম,—ভূত বলে কিছু নেই এ পৃথিবীতে। মিছেমিছি ভয় পেয়েছিস তুই।

রাধা সে-কথা শুনবে কেন?

বললে, না গো মা, আমি নিজে দেখেছি। তুমি বললেই হলো কি না! এমনি বড় বড় দুটো চোখ। আমার দিকে তাকিয়ে ঝপ্ করে গাছ থেকে নেমেই ছুটলো ওইদিকে। ওরে বাবা রে! এখনও আমার বুকটা ঢুই-ঢুই করছে মা। আমি আর যাচ্ছি না ওদিকে।

হুলো বেড়ালটাকে আমি গাছে উঠতে দেখেছি। সেইটেই হবে হয়ত।

রাধার সঙ্গে আমাকেও যেতে হলো রান্নাঘরে।

যে জন্যে রাধাকে রাখলাম তা আর হলো না। রাধার ভয় যেন

একটুখানি বেশি। অন্ধকার দেখলেই সে ভয়ে মরে। সন্ধ্যে হলে আর ও পথ মাড়ায় না।

দিন-বেলাবেলি রাত্রের রান্না সেরে নিতে হয়।

আমি যেদিন বাড়ীতে থাকি, রাধার সঙ্গে গিয়ে রান্নাঘরে বসি।

বাড়ীর মালিককে গাছের কথাটা বললাম।

কথাটা তিনি গ্রাহ্যই করলেন না।

দ্বিতীয় দিন আবার বললাম। গাছের এই ডালটা অন্তত কেটে ফেলে দিন।

সেদিন তিনি আমাকে গাছের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়ে গেলেন।

পরে শুনেছিলাম গাছটা তাঁর নয়। যে মাটি থেকে গাছটা উঠেছে সে মাটির মালিক অন্য লোক। গাছের ডালটাই শুধু অনধিকার প্রবেশ করেছে তাঁর ছাতে ; শুধু সেই সুবাদে গাছটাকে সাক্ষী রেখে নীচেকার ওই ফুট-চারেক মাটির জন্য আমাদের বাড়ীর মালিক নালিশ করেছেন আদালতে। সে মামলার ফয়সালা এ-জীবনে হবে কিনা সন্দেহ।

হঠাৎ এই সময় একটা 'কল্' পেলাম। রাত্রের কল। মস্ত বড়লোকের আদুরে একটি ছেলের হয়েছে অসুখ। রাত্রি জেগে তার সেবা করতে হবে। সেইখানেই খাওয়া, সেইখানেই রাত্রিবাস।

নেবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু টাকার অঙ্কটা বেশ ভাল। লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। নিলাম।

বাড়ীতে রইলো গুরুচরণ আর রাধা।

রোজ সকালে আসি। স্নান করে সকাল-সকাল খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আবার সন্ধ্যায় বেরিয়ে যাই কাজে।

ছুটি পেলাম প্রায় দেড় মাস পরে। ছেলেটি সেরে উঠলো।

রাধা বেশ আনন্দেই আছে। শরীরটাও বেশ ভাল হয়েছে।

এখন আর তাকে রোগা বলে মনে হয় না। ভাল করে খেতে পেতো না বলেই তাকে রোগা মনে হতো।

কিছুদিন পরে দেখি রাধা খুব ঘন ঘন বমি করছে।

—কি রে, কি খেয়েছিস? অম্বল-টম্বল হলো নাকি?

রাধা বললে, না গো মা। কিছু হয়নি তো।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। ঘরে ডেকে এনে ভাল করে তাকে পরীক্ষা করতেই অবাক হয়ে গেলাম।

—এ কি করেছিস হতভাগী! তোর যে বাচ্চা হবে।

রাধা সহজে স্বীকার করতে চায় না।

—হেই মা, সে কি কথা গো!

খুব ধমক দিলাম। সত্যি কথা বল!

রাধা কাঁদতে লাগলো।—মরিদিদি সুধাদিদির কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না।

—মুখ দেখাতে পারবি না তো সেকথা আগে ভাবিসনি কেন? কি হয়েছে খুলে বল আমার কাছে।

প্রথমে বলতে কিছুতেই চায় না। খালি কাঁদতে থাকে। তারপর আমার ধমক খেয়ে সত্যি কথা বললে।

—এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি মা, আবার একদিন ভূত দেখলাম ওই গাছটাতে। ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়ে ছুটে এসে গুরুকে জড়িয়ে ধরেছিলাম মা গো, আর আমি কিছু করিনি। তারপর তুমি যেমন বলেছিলে—দু'ঘরে দু'জন শুয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি বলছি মা আমার মনে হতে লাগলো জানলার পথে ভূতটা হাত বাড়াচ্ছে। জানলা দুটো বন্ধ করে দিয়ে গরমে ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠলাম মা। বুকের ভেতরটা টিপ্ টিপ্ করতে লাগলো। মনে হলো আমি মরে যাব। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গুরুকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারছি না। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তারপর এক সময় মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে

উঠতেই গুরু এলো। ভয়ে ভয়ে দোরটা খুলে দিয়ে বললাম, তুমি এই ঘরে এসে এইখানে শোও গুরু। আমি মেঝেতে শুচ্ছি। একা থাকলে আমি মরে যাব।

এই বলে সে কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে বললে, কেন মরতে ডাকতে গেলাম গো মা! ও মুখপোড়া আমার পায়ে ধরতে লাগলো।

বললাম, পায়ে ধরলো আর অমনি গলে জল হয়ে গেলি?

—না গো মা, না—না। এর চেয়ে আমি মরে গেলাম না কেন?

কাঁদতে কাঁদতে মাথা ঠুকতে লাগলো হতভাগী।

বললাম, মরাই তোর উচিত ছিল।

ভাবলাম গুরুচরণকে ডেকে কিছু বলি। কিন্তু বলতে পারলাম না। আমারই লজ্জা হলো।

যেমন মা, যেমন বাবা, তার তেমনি ব্যাটা!

আমিই ভুল করেছি। এরকনভাবে ওদের একা রেখে যাওয়া আমার উচিত হয়নি, রাত্রের কাজটা ছেড়ে দিলেই পারতাম।

গুরুচরণের মা-বাপ কোথায় গেছে কিছুই সে জানে না। মা-বাপ থেকেও নেই। তারই সঙ্গে রাধার বিয়ে দিয়ে দিই। এ ছাড়া হতভাগীর বাঁচবার কোনও পথ নেই। পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানের মা হয়ে বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাবার এই একমাত্র পথ।

রাত্রে রাধা আমার কাছে শুয়েছিল। কথাটা তাকে বলতেই মুখখানা তার আনন্দে উজ্বল হয়ে উঠলো।

পুরুত ডেকে বিয়ে দেওয়ার হাঙ্গামা অনেক। জাতিবর্ণে কোথাও কোনও মিল নেই। জ্ঞাতি-গোত্র সবই আমার অজানা। তার চেয়ে রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে দেওয়াই ভালো। দেরি করে লাভ নেই। কাল একটু খোঁজখবর নিয়ে সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনজনে বেরিয়ে পড়লেই চলবে।

চা-পর্ব শেষ করে আমি কল-ঘরে ঢুকলাম স্নান করবার জন্যে। যাবার আগে রাধার হাতে তিনটে টাকা দিয়ে বলে গেলাম যা তুই গুরোকে বাজার যেতে বল। আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে পারবো না।

কল-ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি রাধা আমার ঘরে বসে বসে কাঁদছে।

—কি রে ? কি হলো ? কাঁদছিস কেন ?

টাকাদুটি আমার পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে রাধা বললে, ঝগড়া করলে গো মা, আমার সঙ্গে ঝগড়া করে আমাকে দু'ঘা মেরে দিয়ে পালালো নেমকহারাম। বললে, তুই বললি কেন দিদিকে ?

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় পালালো ?

—তা কি আর আমাকে বলে গেল মুখপোড়া !

—বইটইগুলো রেখে গেছে তো ?

—আ আমার পোড়া কপাল। বলেই রাধা তার কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললে, তবে আর বলছি কি ! বইখাতা আর দুটো কাপড় জামা সেই ঝোলাটায় পুরে কাঁধে ফেলে দিয়ে তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম, বললাম, তোমার পায়ে পড়ি—ফিরে এসো। তা একবার ফিরেও তাকালো না মা।

বলতে বলতে আবার চোখদুটো তার জলে ভরে এলো।

কলেজে খোঁজ করবো তারও উপায় নেই। এতদিন যে রইলো গুরুচরণ তা একটি দিনের জন্যও আমি জিজ্ঞাসা করিনি—কোন কলেজে সে পড়ে।

মরুক গে যাক, যা হয় তাই হবে। এইসব কথা ভাবতে গেলে পুরুষ-জাতটার ওপরে ঘেন্না ধরে যায়।

তবু একবার রাধাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ও কোন কলেজে পড়ে তুই জানিস ?

রাধা বললে, হেই মা, তা আমি ক্যামনে জানবো গো ? সে কি আর পোড়ারমুখো বলেছে আমাকে ?

গুরুচরণ চলে গেল, কিন্তু যাকে সে দিয়ে গেল সেই অনাগত শিশুর চিন্তাতেই রাধা মশগুল !

যখনই নজর পড়ে, দেখি—ছেঁড়া কাপড় দিয়ে সে ছোট ছোট কাঁথা সেলাই করছে। কোনও দুঃখ নেই, কোনও চিন্তা নেই, দিনরাত সে গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মা হবার সেই সর্বনাশা সাধ !

এক এক সময় আনন্দও হয়, আবার রাগও ধরে।

—হাসছিস তো হতভাগী গানও তো গাইছিস খুব, কিন্তু ছেলে হোক মেয়ে হোক—সে যখন তার বাপের পরিচয় চাইবে, সারা দুনিয়া যখন সেই এক প্রশ্ন নিয়ে তোর কাছে এসে দাঁড়াবে, কি কৈফিয়ৎ দিবি তুই ? সেই প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখচ্ছবি !

হাসতে হাসতে বলে, বলবো সে মরে গেছে। বলবো—আমি বিধবা।

সব ধর্মের চেয়ে বড়, সব সংস্কারের চেয়ে প্রাচীন, সব আকাঙ্ক্ষার চেয়ে প্রবল—জননীজীবনের পবিত্র সুন্দর অনুভূতি তাকে এমন একটি জায়গায় টেনে এনেছে, যেখান থেকে সে এই সংসারের যাবতীয় নিন্দা অপবাদের বোঝা হাসিমুখে বহন করতে প্রস্তুত।

শেষ পর্যন্ত হলোও তাই

আমি নিজে ধাত্রী। কোথাও যাবার প্রয়োজন হলো না। আমারই একখানা ঘরে রাধার আঁতুরঘর তৈরি করে দিলাম।

সেইখানে রাধার একটি ছেলে হলো।

স্বাস্থ্যবান সুন্দর একটি সন্তানের জননী হলো রাধা।

কর্পোরেশনের রেজিস্ট্রারে লিখিয়ে দিলাম—রাধা বিধবা। স্বামীর নাম ঈশ্বর গুরুচরণ বসু।

গুরুচরণের অবাঞ্ছিত সেই সন্তানটিকে নিয়ে রাধার আনন্দ যেন আর ধরে না।

রাধার যত আনন্দ, আমার তত উদ্বেগ।

অনির্বাণ এই মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। হতভাগী আবার যদি কোনও অপরাধ করে বসে, তাই একদিন বললাম, রাধা, তোর একটি বিয়ে দিয়ে দিই।

রাধা হাসতে লাগলো—হেই মা, আমাকে কে বিয়ে করবে গো ? আমি যে ছেলের মা !

বললাম, ও ছেলেকে আমি আমার এক বন্ধুর নার্সারীতে রেখে দেব। সেইখানে ও মানুষ হবে।

রাধা ভেবেছিল আমি বুঝি-বা হাসি-রহস্য করে বলছি।

—আচ্ছা বেশ, তাই হবে।

বলেই সে ছেলেটাকে পায়ের ওপর শুইয়ে নাচাতে লাগলো।—এই সোনা, তুই আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবি ? চুপ করে রইলি কেন ? জবাব দে।

রাধা ছেলেটার নাম রেখেছে সোনা।

ছেলেটা কাঁদতে জানে না। শুধু হাসে।

তার সেই হাসি-হাসি মুখের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে রাধা বলে, একে ছেড়ে আমিই-বা থাকবো কেমন করে গো ?

বললাম, তোর তো আবার হবে।

—আবার হবে ?

কথাটা শুনে উল্লসিত হয়ে উঠলো রাধা।

—এর নাম সোনা। তার নাম রাখবো মাণিক।

—হ্যাঁ হ্যাঁ মাণিক, হীরে, চুনি, পান্না—যত খুশী নাম রাখাব। স্বামী পাবি, সংসার পাবি, আর এ কি একটা জীবন নাকি ? ভয়ে লজ্জায় কাঠ হয়ে থাকতে হবে। ওই ছেলের কাছে মুখ তুলে দাঁড়াতে

পারবি না।

অনেক করে বোঝানো পর রাধা রাজী হলো। রাজী হলো একটি বিয়ে করতে।

রাধা রাজী যখন হলো, তার সোনার বয়স তখন প্রায় বছরখানেক। ছেলেটা এক-পা এক-পা করে হাঁটতে শিখেছে।

ছোট ছেলেমেয়েদের নার্সারীতে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম প্রথমে, কিন্তু এরকম ছেলেকে নিতে রাজী হলো না তারা।

কিছুদিন আগে 'কল' পেয়েছিলাম একটি বাড়ীতে। সেখানে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। মেয়েটির নাম নীরা। স্বামীর অবস্থা ভাল, কিন্তু নিরানন্দের সংসার। আমি গিয়েছিলাম মেয়েটির সেবা করতে। কঠিন একটা ব্যারামের জন্যে 'ওভেরী'র ওপর অপারেশন হয়ে গেছে। সন্তানাদি হবার আশাভরসা নেই। মা সে কোনোদিনই হবে না। অথচ একটি ছেলের জন্য সে পাগল। আমাকে বলেছিল—তোমরা অনেক জায়গায় তো যাও দিদি, মা-বাপ-মরা ছেলে যদি একটি পাও তো দেখো। আমি মানুষ করবো। এমনি নেবো না। কিছু টাকাও দেবো।

এদিকে কাগজে একটি বিজ্ঞাপনও দিয়েছে। কোনও সহৃদয় যুবক যদি কোনও অনাথা যুবতীকে বিয়ে করতে চায় তো সে নিজে এসে মেয়েটিকে দেখে যেতে পারে।

নীরা এলো প্রথমে। রাধার ছেলেটিকে দেখে তার দেরী হলো না। বললে, সবই আমি শুনেছি, সবই আমি জানি। সব কিছু জেনে শুনেই তোমার ছেলেটিকে আমি নিতে এসেছি ভাই।

আমিও অনেক করে বোঝালাম রাধাকে।

—ছেলের মা হওয়ার সাধটাই না হয় মিটলো, কিন্তু ওই ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে হবে, মানুষ করে তুলতে হবে। তা তো তুই পারবি না কোনোদিন।

রাধা কি যেন ভাবলে। ভেবে বললে, আজকের দিনটা থাক, তুমি কাল এসো।

নীরা আবার এলো তার পরের দিন।

মস্ত এক মোটর এসে দাঁড়ালো আমাদের দরজায়। নীরা একা আসেনি। সঙ্গে এসেছে একজন ঝি। আর এনেছে এক হাজার টাকা রাধাকে দেবার জন্যে।

একসঙ্গে এক হাজার টাকা রাধা তার জীবনে বুঝি এই প্রথম দেখলে।

নোটগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে রাধা বললে, নিয়ে যাও ছেলেটাকে। ও নিমকহারামের ছেলেকে আমি রাখতে চাই না।

ছেলে নিয়ে নীরা চলে গেল।

রাধা খানিক কাঁদলে। কেঁদে আবার নিজেই চুপ করলে।

নোটগুলো আমার হাতে দিয়ে বললে, রাখো এগুলি। কচি একটা বাচ্চা চলে গেল, মনে হচ্ছে যেন কত কাজ হালকা হয়ে গেল। চল, আমাকে এই ভূতুড়ে গাছতলাটা পার করে দেবে চল। রান্নাঘরে বসে রান্না করিগে যাই। অনেকদিন ভাল রান্না করিনি।

রাধার সঙ্গে আমিও গেলাম রান্নাঘরে।

রাধা বললে, হাঁ গো মা, আমার তুমি বিয়ে দিতে চাচ্ছ কেন? বিয়ে দিলে সে মানুষটা যদি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চায়. তখন তুমি কি করবে? কে তোমাকে রান্না করে দেবে?

বললাম, আমি একা মানুষ, যেমন ছিলাম তেমনি থাকবো।

রাধা কি যেন ভাবলে। ভেবে বললে, না মা, বিয়ে তুমি আমার দিও না। আমি যাব না এখান থেকে।

—দূর পাগলী, তাই কি হয়? তোর জীবনটাকে আমি নষ্ট করে দিতে চাই না।

ওদিকে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে গেছে। বক্স নম্বরে

রোজ দু'চারখানা করে চিঠি আসছে।

দু'খানা চিঠির জবাব দিতেই প্রথম দিন যিনি এলেন রাধাকে তাঁর পছন্দ হলো না। বললেন, আমি একটু লেখাপড়া জানা মেয়ে চেয়েছিলাম।

দ্বিতীয় দিন যাকে ডেকেছিলাম, তারা এলো দুজন। যে-ছেলেটি বিয়ে করবে সে নিজে, আর তার সঙ্গে আর-একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক—ছেলেটির হিতৈষী বন্ধু।

তিনিই আমার সঙ্গে কথা বললেন। ছেলেটিকে দেখিয়ে বললেন, এই ছেলেটি বিয়ে করবে। মাসে পাঁচ-ছ' শ' টাকা রোজগার করে। বেহালার একটি দোকান আছে। বেহালা তৈরী করে, মেরামত করে। বেহালা বাজাতেও জানে।

জিজ্ঞাসা করলা, অপনি ওর কে হন ?

তিনি বললেন, আমি কেউ নই মা। ওর দোকানের পাশেই আমার কাটা কাপড়ের দোকান। আপনার বিজ্ঞাপনটি আমার চোখেই পড়েছিল। রতনকে দেখি—ওই দোকানেই শোয়, দোকানেই ঘরবাড়ী। —খাবার সময় দুবেলা হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসে। একদিন বলেছিলাম —এত ভাল রোজগার কর তো একটি বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার পাতো না কেন ? রতন বলেছিল—'আমার আপনার বলতে কেউ কোথাও নেই। বিয়ে আমার দেবে কে ?' সেদিন তাই বিজ্ঞাপনটি দেখিয়ে বললাম—'এইখানে একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়!' এই বলে আমিই সেদিন চিঠি লিখেছিলাম। এইবার আপনি মেয়েটির খবর বলুন। মেয়েটি আপনার কে হয় ?

বললাম, মেয়েটি আমার কেউ নয়। বেচারার কেউ কোথাও নেই। আমার এখানে এসেছে আমার রান্না করে দেবে বলে। রান্নাই করে এখনও। কিন্তু আমি দেখছি—এইটে ওর বিয়ের বয়স। গরীব বলে কি দাসীবাঁদীর কাজ করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে ? তাই আমারও

ইচ্ছে—ওর একটি বিয়ে-থা দিয়ে ওকে সংসারী করে’ দিই।

ভদ্রলোক বললেন, তাহলে বেশ ভালই মিলে গেছে দেখছি। ডাকুন মেয়েটিকে। আমরা একবার দেখি। রতনও দেখুক ওর পছন্দ হয় কিনা।

রাধাকে ডাকলাম।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, কি গো মেয়ে তোমার নাম কি ?

রাধা বললে, আমার নাম রাধা। রাধা রাণী দাসী।

—দাসী ? কি জাত ?

রাধা বললে, বোষ্টম। আপনারা যাকে বোরেগী বলেন।

ভদ্রলোক রতনের দিকে তাকালেন। বললেন, ভালই হলো। তোমরা তো ময়রা ?

রতন বললে, হ্যাঁ।

—পছন্দ হয়েছে ?

লজ্জায় রতন বোধ করি মুখে কিছু বলতে পারলে না, মাথাটা শুধু কাৎ করে তার সম্মতি জানালে।

ভদ্রলোক আবার রাধার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের নতুন করে সংসার পাততে হবে।

রাধা বললে, আমি কিন্তু এইখানেই থাকবো। এখান থেকে যাব না।

ভদ্রলোক বললেন, তা সে তোমরা দু’জনে পরামর্শ করে যা ভাল বুঝবে করবে। ওরও কেউ নেই, তোমারও কেউ নেই।

রাধা হঠাৎ বলে বসলো, আমার একটা ছেলে আছে।

চোখের সুমুখে মনে হলো যেন বজ্রপাত হয়ে গেল। মনে হলো ঠাস করে রাধার গালে একটা চড় বসিয়ে দিই।

কথাটা শুনে ওঁরাও যে একটুখানি অবাক হয়ে গেছেন।

—কার ছেলে ? তোমার ?

রাধা বললে, হ্যাঁ গো আমার। খুব সুন্দর ছেলে।

—কত বড় ছেলে ?

—তা বছর-খানেকের হবে। না কি বল গো মা ?

বলেই পোড়ারমুখী আমার দিকে তাকালো।

আমার মুখ দিয়ে তখন কথা বেরুচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন এই দুটী মানুষকে প্রতারণা করবার জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমি ডেকে এনেছি।

কাটা কাপড়ের দোকানদার সেই ভদ্রলোকটী আমারই মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, ছেলের বাপ কি মারা গেছে ?

আমি কিছু বলবার আগেই রাধা বলে উঠলো, না না মরেনি গো, ভয়ে পালিয়েছে। সে আর এমুখো হচ্ছে না। আসুক না একবার ! তাকে আমি ঝাঁটা মেরে বিদেয় করবো !

ওঠো রতন।

ভদ্রোলোক উঠলেন। যাবার আগে বলে গেলেন কথাটা আপনি বিজ্ঞাপনে লিখে দিলেই পারতেন।

কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। ভেবেছিলাম রাধাকে তিরস্কার করবো।

কিন্তু কেন ? কেন তাকে তাকে তিরস্কার করবো ? রাধা সত্য কথাই বলেছে। অন্যায় কিছু করেনি।

অন্যায় যদি কেউ কিছু করে থাকে তো সে অন্যায় করেছিলাম আমি। সত্য গোপন করে রাধার বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। মনে হয় বুঝি-বা নিজেরই অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করতে চেয়েছিলাম রাধাকে দিয়ে।

হঠাৎ সিঁড়ির ওপর জুতোর শব্দ হতেই তাকিয়ে দেখি রতনকে নিয়ে সেই কাটা কাপড়ের দোকানদার আবার উঠে আসছেন।

—এই নিন, রতন কি বলছেন শুনুন।

—কি বলছে ?

—বলছে আপনার যদি কোনও আপত্তি না থাকে তো রতন এই মেয়েটীকেই বিয়ে করবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, মতটা হঠাৎ বদলে গেল কেন ?

—ওই যে, সত্যি কথা বলেছে।

—তাহলে সত্যি কথা বলে ভালই করেছে বলুন !

ভদ্রলোক ভাল করে চেপে বসলেন। বললেন, কি জানি মা, আজকালকার দিনে এইসব চলছে। আমাদের কালে চলতো না।

রাধাকে বললাম, এঁদের ভাল করে মিষ্টিমুখ করিয়ে দে।

সুবর্ণা ছুটি পুরুষ-চরিত্রে কথা বললে। ছুজন ছু' রকমের।

তার পরেই ধরে বসলো, এবার আপনি কিছু বলুন।

সুবর্ণাকে দেখে অবধি আমার সুজাতার কথা মনে হচ্ছিল। স্ত্রীকে বললাম, সুজাতার কথা তোমার মনে আছে ?

স্ত্রী বললে, খুব মনে আছে। তাকেও তো তুমি এমনি করে ধরে বসেছিলে।

সুবর্ণা বললে, তাহ'লে এবার সেই সুজাতার কথা আমাকে বলুন।

বললাম, তাহ'লে শোনো।

সুজাতা একদিন ঝড়ের মত এসে ঢুকলো আমার ঘরে ঢুকেই বললে, এ-সব কী লিখছেন। আপনি ? গ্রামের গল্প আর লিখবেন না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ?'

'আপনাদের দেখা সে গ্রাম আর নেই। গ্রামগুলো সব শহর হয়ে গেছে।

..তাহলে কি লিখবো ?

লিখবেন আধুনিক কালের গল্প। আজকালকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে গল্প লিখুন।

বললাম, আমার নিজের ছেলেমেয়ে নেই। আজকালকার ছেলে-মেয়েদের আমি চিনি না।

সুজাতা বললে, আমাকে তো চেনেন, আমাকে নিয়ে গল্প লিখুন।

বললাম, তোমাকে আর কতটুকু চিনি। তবে তুমি যদি তোমার জীবনের ঘটনা আমাকে বলতে পারো তাহ'লে না হয় একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

সুজাতা কি যেন ভাবলে একটুখানি। ভেবে বললে, মুখে বলতে পারব না। লিখে জানিয়ে দেবো।

বলেছিলাম, বেশ তাই দিও। আমি চেষ্টা করব লিখবার।

বেশিদিনের পরিচয় নয়। আমাদের কাছাকাছি ছোট একটি একতলা বাড়িতে ভাড়া এসেছে সুজাতা। চমৎকার দেখতে। যেমন গায়ের রং, তেমনি স্বাস্থ্য। বয়স বোধকরি পঁচিশের কাছাকাছি। পরিপূর্ণ যৌবন। একবার চোখ পড়লে আর চোখ ফেরানো যায় না।

সুজাতা নিজে আর তার স্বামী। ছেলেপুলে এখনও হয় নি।

আমার স্ত্রীর কাছে আসে—বই চাইতে।

দুপুরটা আর কাটতে চায় না, দিদি। ভাল দেখে একখান বই দাও।

ভাল-মন্দ জানি না বাপু, ওই আছে, দেখেশুনে নিয়ে যা।

হেসে হেসে গড়িয়ে পড়লো সুজাতা।

তুমি বলছো কি দিদি? লেখকের বউ হয়ে বলছো—বই-এর ভাল-মন্দ জানো না! আমি যদি লেখকের বউ হতুম—

পাশের ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম সবই! চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, কে লেখকের বউ হতো?

আমি—আমি। বলতে বলতে সুজাতা আমার ঘরে ঢুকলো।

হায় রে কপাল! বই এত ভালবাসি, তবু একটা লেখক জুটলো না।

আমার স্ত্রী দোরের কাছে এগিয়ে এসে বললে জোটে নি তোর কপাল ভাল। জুটলে মজাটা বুঝতে।

বললাম, শুনলে তো ?

সুজাতা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। আমার লেখার দিকে তাকিয়ে বললে, লিখছেন তো ?

কী ?

আমি যা বলেছি লিখতে।

বললাম, আরম্ভ করেছি। এই ছাখো—

সুজাতা বসলো ভাল করে। বললে, পড়ুন। শুনি।

যতটুকু লিখেছিলাম পড়ে শুনিয়ে দিলাম।

লিখেছিলাম—

আমাদের দেশের গ্রামগুলো ধীরে-ধীরে বদলে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও বদলে যাবে। তখন হয়ত গ্রামকে গ্রাম বলে আর মনেই হবে না। সবই মনে হবে শহর।

তখন হয়ত গ্রামের বাড়ির দরজায়-জানালায় পর্দা ঝুলবে। ঘরে ঘরে রেডিয়ো বাজবে। ইলেকট্রিকের আলো জ্বলবে। আর সেই আলো-ঝলমল্ গ্রামের ড্রইংরুমে বসে পুরাকালের গ্রাম সম্বন্ধে কত মজার মজার গল্প শুনবেন আপনারা। শুনবেন হয়ত গ্রামের মানুষগুলো ছিল অসভ্য, ছিল বর্বর! শুনে হয়ত অবাক হয়ে যাবেন যে, পৃথিবীর সভ্য দেশগুলোর নামই জানতো না তারা। জানতো না—সে-সব সভ্য দেশের মানুষ কত উদার, কত মহৎ।

জমিতে ফসল না হলে গ্রামের লোক হাঁ করে তাকিয়ে তাকতো আকাশের দিকে। অথচ ইওরোপ নামে যে মহাদেশ আছে, সেই দেশ

যে আমাদের ক্ষুধার অন্ন যোগাতে পারে, কোটি কোটি টাকার খাদ্যবস্তু পাঠাতে পারে—সে খবর তারা রাখতো না।

গ্রামের লোক ছিল অসভ্য এবং অশিক্ষিত। কাঠের একটা ছোট্ট ঘানি তৈরি করে গরু দিয়ে টানিয়ে সরষে পিষে তেল তৈরি করে খেতো। কাঁড়ি কাঁড়ি দুধ নষ্ট করে উনোনে জ্বাল দিয়ে একরকম খাদ্য তৈরি করতো—তার নাম ছিল ঘি। হাতে চাকা ঘুরিয়ে মাটির নানারকম বাসন তৈরি করে সেইগুলো পুড়িয়ে নিয়ে ব্যবহার করতো। মুড়ি খেতো, গুড় খেতো, আর খেতো বাটি বাটি দুধ। সেই দুধকে জমাট বাঁধিয়ে গুঁড়ো করে সারা বছর ধরে যে খাওয়া যায় সে কথা কেউ জানতো না। সুসভ্য ইওরোপ সে কথা জানিয়ে দিলে ইণ্ডিয়াকে। অনুন্নত ইণ্ডিয়ার অবনত গ্রামগুলোকে উন্নত হবার মন্ত্র শিখিয়ে দিলে। শিখিয়ে দিলে গ্রামকে কেমন করে শহর করে তুলতে হয়। শিখিয়ে দিলে কণ্ট্রোল আর ব্ল্যাক মার্কেটের মহিমা। শিখিয়ে দিলে কোল্ড ষ্টোরেজের মাহাত্ম্য।

অনুন্নত গ্রাম বিলুপ্ত হলো। তার জায়গায় জেগে উঠলো উন্নত শহর। আর সেই সব শহরে জন্মগ্রহণ করলে সুসভ্য সন্তান-সন্ততি।

এই পর্যন্ত লিখেছিলাম।

সুজাতা শুনলে। শুনে বললে, এগুলো আপনার রাগের কথা। ও-রকম করে লিখতে আপনাকে বলি নি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি রকম করে লিখতে বলেছিলে?

সুজাতা বললে, বলেছিলাম-গ্রামের গল্প লিখবেন না। বলেছিলাম—আপনারা সবাই যদি পিছু হাঁটতে আরম্ভ করেন, আপনি লেখেন চল্লিশ বছর আগেকার গ্রামের গল্প আর-একজন লেখেন ইতিহাসের বাদশা-বেগমদের গল্প, আর-একজন লেখেন—

থামিয়ে দিলাম সুজাতাকে। বললাম, বুঝেছি। বুঝেছি তুমি কি বলতে চাও। কিন্তু যে-যুগটিকে তুমি চোখে ছাখো নি, সেই যুগ আর সেই যুগের মানুষগুলিকে যদি আমরা তোমাদের চোখের সামনে এনে ধরে

দিতে পারি—সেটাও তো কম কথা নয়!

সুজাতা বললে, তাহলে এ যুগের কথা কে লিখবে? আমাদের কথা লিখবে কে?

লিখেছে তো! বললাম, সাহিত্যিক তো আমি একা নই, অনেকেই তো লিখেছে তোমাদের কথা।

সুজাতা জোর করে বলে উঠলো, না। লিখছে না। সবাই মজা করছে আমাদের নিয়ে। একটু রং ফর্সা চেহারা ভাল হয়েছে কি বাস্—প্রেম। আমরা যেন শুধু প্রেম করেই বেড়াচ্ছি। দেহ ছাড়া যেন আর কোনও কথা নেই। আমাদের মনের দিকে কেউ একবার ফিরেও তাকায় না।

বললাম, ভুল বলছো সুজাতা। তোমাদের মনের কথায় বাংলা-সাহিত্য ভরে আছে।

না। সেগুলো আমাদের মনের কথা নয়। আপনাদের মনের কথা।

বললাম, বেশ, তাহ'লে তোমার মনের কথা বল আমাকে। আমি লিখবো।

সুজাতা আবার বললে, মুখে বলতে পারব না। লিখে দেবো, আপনি কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন।

অপেক্ষা অবশ্য বেশীদিন করতে হলো না। হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল।

যে-জায়গায় আমরা ছিলাম, কলকাতার সে অঞ্চলটা আগে নাকি ছিল একটা জলা জায়গায়। এখন আর সেটাকে চেনবার উপায় নেই। চারিদিকে বড় বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ইমারত-অট্টালিকায় জায়গাটা ভরে গেছে।

সেই রকম একটা নতুন বাড়িতে হবে গৃহ প্রবেশের উৎসব। পাড়াটা নতুন। কেউ কারও পরিচিত নয়। এইটেই বোধ করি পরিচয়ের উত্তম সুযোগ—এই ভেবেই সম্ভবত এক ভদ্রলোক গাড়িতে চড়ে সব বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে গৃহ-প্রবেশের নেমন্তন্ন করে গেলেন। মেয়ে-ছেলে—সকলের নেমন্তন্ন।

সুজাতারও নেমন্তন্ন ছিল।

আমার স্ত্রীর সঙ্গে খেতে গিয়েছিল সুজাতা। কিন্তু কী ব্যাপার যে সেখানে হয়েছে কে জানে। পরের দিন সকালে উঠেই আমার স্ত্রী বললে, মেয়েটাকে একবার দেখে আসি। কাল খেতে গিয়ে কী যে হলো সুজাতার, পেটে এমন একটা ব্যথা উঠলো যে—না পারলে খেতে, খেতে, না পারলে বসে থাকতে। বাড়ি চলে এলো তাড়াতাড়ি।

সারাদিনের পর বিকেলে আমার স্ত্রী গিয়েছিল সুজাতাকে দেখতে। গিয়ে দেখে সে বেশ ভালই আছে। বাড়ির জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। আজই তারা এ-বাড়ি ছেলে কলকাতার বাইরে চলে যাবে। খুব ভাল একটা কাজ পেয়েছে তার স্বামী। ঠিক সময়ে না পৌঁছোতে পারলে কাজটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। সুজাতার স্বামী নাকি গেছে ট্যাক্সি ডাকতে।

সংবাদটা পেলাম আমার স্ত্রীর মুখে। সুজাতা নাকি খুব দুঃখ প্রকাশ করেছে যাবার সময় আগে দেখা করে যেতে পারলে না বলে। বলেছে—সেখান থেকে চিঠি লিখবে।

চিঠি কিন্তু সুজাতা লেখেনি!

চিঠি লিখলে না, নিজের জীবনের কথাও বললে না, কাজেই তাকে নিয়ে আমার গল্প লেখাও হলো না।

ভুলেই গিয়েছিলাম সুজাতার কথা।

মেয়েটা ঝড়ের মত এলো আবার ঝড়ের মতই চলে গেল।

বছর তুয়েক পরেই বোধহয়। গিয়েছিলাম ভবানীপুরে। ফেরবার সময় ভিড়ের জন্য ট্রামে-বাসে উঠতে পারলাম না। একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। ফাঁকা ট্যাক্সি। উঠে পড়লাম।

কোথায় যাবেন?

ড্রাইভার মুখ ফেরাতেই মনে হলো যেন চেনা-চেনা মুখ। বললাম, পাকপাড়া।

ট্যাক্সি চলতে লাগলো। আমি কিন্তু ক্রমাগত ভাবতে লাগলাম—কে এই ড্রাইভার ভদ্রলোক? গাড়ি যখন শ্যামবাজারের মোড়ে, তখন হঠাৎ মনে পড়লো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হচ্ছে না। সুজাতার স্বামী—নির্মলবাবু ট্যাক্সি চালাচ্ছেন ভাবতেও পারছি না।

গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, আপনি নির্মলবাবু না?

ভদ্রলোক একটু হেসে জবাব দিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুজাতা কেমন আছে?

ভাল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় আছেন আপনারা?

সাত নম্বর সুরেশ সরকার লেন—এই তো সিঁথির কাছে।

এই বলে গাড়িটা তাড়াতাড়ি চালিয়ে দিলেন তিনি। কথা বলবার আর অবসর পেলাম না।

ঠিকানাটা আমার মনে ছিল। সাত নম্বর সুরেশ সরকার লেন। সিঁথির কাছে।

গেলাম একদিন বেড়াতে বেড়াতে। সাত নম্বরে গিয়ে দেখি—দোরে তালা বন্ধ। বিকেল তখন চারটে।

এ সময় সুজাতা গেল কোথায়? নির্মলবাবু না হয় ট্যাক্সি নিয়ে ঘুরছেন, কিন্তু সুজাতার তো এ সময় বাড়িতে থাকবার কথা।

দেখলাম, ঘরের জানালাটা খোলা। ঘরের ভেতর মনে হলো যেন একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে। জানলার কাছে এগিয়ে গেলাম।

খোলা জানলার পথে সত্যিই দেখলাম—তালাবন্ধ ঘরের ভেতর বছর-খানেকের একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে কাঁদছে। উপুড় হয়ে ঘরের মেঝের মেঝের ওপর শুয়ে আছে ছেলেটি। আর তার একটা পা কাপড় দিয়ে খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধা।

নির্মলবাবু তাহলে আমাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছেম।

সুজাতার তো ছেলেপুলে নেই।

কিন্তু কে এমন নিষ্ঠুর মা—ছেলেকে যে এমনি করে বেঁধে রেখে গেছে বাড়িতে?

বাড়ি ফিরে আসছিলাম, রাস্তায় দেখা—সুজাতার সঙ্গে।

সেই সুজাতা। চেহারায় কোথাও এতটুকু পরিবর্তন নেই। মনে হয় যেন আরও সুন্দরী হয়েছে সে।

আমাকে দেখেই একগাল হেসে বললে, এই দেখুন, আপনার কথাই ভাবছিলুম। আসুন! আসুন!

বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘরখানা খুলে আগেই ছেলের পায়ের বাঁধন খুলে দিলে। তারপর ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে কান্না থামাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলে কি তোমার?

হ্যাঁ। বলে ছেলের কান্না থামাবার জন্যে সুজাতা একটুখানি আড়ালে চলে গেল।

ছেলের কান্না বন্ধ হলো।

সুজাতাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার কথা শুনতে পাচ্ছি।

একটুখানি চা খাবেন তো ?

বললাম, না। ছেলে নিয়ে তোমাকে চা করতে হবে না।

ও আমার অভ্যেস আছে। আপনি দেখুন না!

ছেলেকে একা ফেলে রেখে কোথায় গিয়েছিলে ?

রোজই তো যাই। ইস্কুলে চাকরি করি যে!

নির্মলবাবু ট্যাক্সি চালিয়ে যা রোজগার করেন হয়ত তাতে কুলিয়ে উঠতে পারে না, তাই সুজাতাকেও বোধহয় চাকরি করতে হয়। সে প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল।

বললাম, আরও কিছুদিন পরে চাকরি নিলেই পারতে। ছেলেকে ওইরকম করে ফেলে রেখে—

কথাটা সুজাতা আমাকে শেষ করতে দিলে না।

আপনি পাড়াগাঁয়ের মানুষ—সেকেলে লোক। আপনি জানেন না এ-যুগের সমস্যা। আপনাদের যুগে ছেলেমেয়েদের শুধু খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে তুলতো, মানুষ হলো না জানোয়ার হলো—ভূত হলো না প্রেত হলো—সে সব কিছু দেখতো না।

বলতে বলতে ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে এলো সুজাতা। ছেলে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেকে খাটের ওপর শুইয়ে দিয়ে বললে, এই ছেলেকে মানুষ করে তুলতে হবে। ওকে লেখাপড়া শেখাতে হবে। বিলেত পাঠাতে হবে। তার জন্যে জন্যে টাকা চাই তো!

বললাম, সেই জন্যেই বুঝি চাকরি করছো ?

হ্যাঁ, সেই জন্যেই চাকরি করছি। সেই জন্যেই এত কষ্ট করছি।

খুব সত্যি কথা।

বললাম, তোমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখবো ভেবেছিলাম। তুমি বলেছিলে—

একদম সময় পাইনি।—ছেলের বিছানার কাছেই উঠে বসলো

সুজাতা।—এই দেখুন না, বই পড়তে এত ভালবাসতুম, কিন্তু গেল দু' বছরে একখানা বইও পড়েছি কি না সন্দেহ। এইটেই হচ্ছে এ যুগের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। মানুষের অবসর একেবারে নেই।

ছেলের মাথায় হাত চাপড়াতে চাপড়াতে সুজাতা বললে, ভেবেছিলুম আমার জীবনের কথা আপনাকে লিখে জানিয়ে দেবো, কিন্তু সময় পেলুম না। এখন তো আমার সময় একেবারে নেই।

বললাম, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আচ্ছা, আজ আমি চলি। আবার একদিন আসবো।

এই বলে উঠে দাঁড়ালাম।

সুজাতা বললে, চললেন ?

হ্যাঁ। আমার একটা কাজ আছে।

বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। সুজাতা কিন্তু চায়ের কথা আর একটিবারও বললে না, বসবার জন্যে পীড়াপীড়িও করলে না।

বাড়ি ফিরে এসে সুজাতার কথা বললাম আমার স্ত্রীকে।

স্ত্রী বললে, চল আমি একদিন যাব তোমার সঙ্গে। তার ছেলে দেখে আসবো।

আমরা দুই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বেরিয়েছিলাম সেদিন সুজাতার বাড়ি যাবার জন্য। কিন্তু যাওয়া আর হলো না। দোরের কাছে একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। ট্যাক্সি থেকে নামলেন সুজাতার স্বামী নির্মলবাবু।

বললাম, ভালোই হলো, চলুন—আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম। এই গাড়িতেই উঠে পড়ি।

নির্মলবাবু বললেন, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

বেশ তো—যেতে যেতে গাড়িতেই বলবেন।

নির্মলবাবু রাজী হলেন না। বললেন, না, গাড়িতে বলা হবে না। চলুন আপনার ঘরে গিয়ে বসি।

আবার বাড়িতেই ফিরতে হলো।

কথাটা নাকি খুব গোপনীয়। স্ত্রীকে সরিয়ে দিলাম ঘর থেকে।

নির্মলবাবু বললেন, কথাটা কেমন করে আরম্ভ করবো বুঝতে পারছি না। সুজাতা আপনাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করে। আপনার কথা সে শুনবে, তাই আপনার কাছেই এলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, সুজাতাকে কিছু বলতে হবে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সুজাতা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

কথাটা শুনে আমি একটুখানি অবাক হয়ে গেলাম। অবাক হবার মতই কথা। বললাম, সুজাতা তো সেরকম মেয়ে নয়।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সুজাতা খুব ভাল মেয়ে। এই দেখুন না, ট্যাক্সি চালিয়ে আমি যা রোজগার করি তাতে আমাদের বেশ ভালই চলে যায়। সুজাতা কিন্তু সে টাকা নেবে না কিছুতেই। আমাকে সরিয়ে দিয়ে ইস্কুলের চাকরি নিলে।

আপনারা কি এক বাড়িতে থাকেন ?

আজ্ঞে না। আমি এখন থাকি একটা হোটেলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন এরকম হলো বলুন তো ? ছেলের বাপ আপনি—

নির্মলবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে দেখলাম তিনি কি যেন ভাবছেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, একটি ছেলেকে ভালবেসেছে সুজাতা। সে এলে ওরা দুজন একসঙ্গে থাকবে। কিন্তু এই আমি বলে রাখছি— আপনি দেখবেন, সে আসবে না। আসতে পারবে না।

সে আবার কি রকম কথা ? আপনি ছেড়ে না দিলে সুজাতা তো এ কাজ করতে পারে না! সে আইন তো নেই!

নির্মলবাবু বললেন, সুজাতা জানে—আমি কিছু করবো না।

বলেই আবার কি যেন ভাবতে লাগলেন নির্মলবাবু।

চাকর এসে চা দিয়ে গেল নির্মলবাবুর হাতের কাছে নামিয়ে। আমার গৃহিণী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আবার চা কেন? বলেই চায়ের কাপটি নাড়াচাড়া করতে করতে নির্মলবাবু বললেন, আপনি গিয়েছিলেন সুজাতার কাছে। সে কিছু বলে নি?

বললাম, না।

বলবে না আমি জানি। ভারি চাপা মেয়ে। এই যে এই ট্যাক্সিখানা দেখছেন, ওটা একরকম ওরই টাকায় কেনা।

বললাম, সুজাতা টাকা কোথায় পেলে? বাপ-মায়ের অবস্থা খুব ভাল বোধ হয়!

চা খেতে খেতে একটু হাসলেন নির্মলবাবু।

বাপ-মা কোথায় পাবেন? একেবারে ভেসে-যাওয়া মেয়ে। এস কে মজুমদার কোম্পানীর নাম শুনেছেন তো? সেই যে বিল্ডিং কনট্র্যাক্‌টার—আপনার বাড়ির কাছাকাছি একখানা বাড়ি তৈরি করলে, তারপর গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন সবাইকে?

বললাম, সেই দিনই তো নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে সুজাতার পেটের যন্ত্রণা হলো—

আজ্ঞে না। কিচ্ছু হয় নি। সেটা যে এস কে মজুমদার—মানে সতীকান্তবাবুর বাড়ি সুজাতা তা জানতো না। সতীকান্তবাবুকে ভিড়ের মাঝে দেখতে পেয়েই ছুট্‌ ছুট্‌ একেবারে ছুটে পালিয়ে এসেই সুজাতা বললে, নির্মল, তল্পি-তল্পা বাঁধো। এখান থেকেও পালাতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, সতীকান্ত মজুমদারকে দেখে পালাতে হবে কেন?

সে সব অনেক কথা স্যার, আপনি শুনবেন? আপনার শোনবার অবসর হবে?

বললাম, শোনবার জন্যেই তো বসেছি। আপনি বলুন। আমি শুনবো।

নির্মলবাবু কেমন যেন ইতস্তত করতে লাগলেন

কথাটা তেমন ভাল নয়, স্যার।

ভাল নয়?

নির্মলবাবু বললেন, আজ্ঞে না, খুব নোংরা কথা। বুঝতেই তো পারছেন—

বললাম, বুঝেছি। থাক্ আর বলতে হবে না।

তাহলে আজ আমি আসি। আমি আবার আসবো আপনার কাছে। আপনি যেন আমার কথাটা একবার বলবেন সুজাতাকে।

হাঁ না কিছুই বললাম না। নির্মলবাবু চলে গেলেন।

ভাবছিলাম সুজাতার কথা। সতীকান্তবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। বয়স পঞ্চাশের ওপর। চমৎকার একখানা গাড়ি প্রায়ই দেখি নিজেই চালিয়ে নিয়ে যান আমার বাড়ির সুমুখ দিয়ে। যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তেমনি হাসিখুশী ভাব। কেনই বা হবে না? প্রচুর পয়সার মালিক। সুজাতা বোধকরি টাকার লোভেই তার সঙ্গে জুটেছিল।

সুজাতা বলেছিল, আজকালকার মেয়েদের নিয়ে গল্প লিখতে।

এই তো আজকালকার মেয়ে!

সেই জন্যই সুজাতা তার জীবনের কাহিনী মুখে বলতে পারে নি। বলেছিল, লিখে দেব।

স্ত্রী ঘরে ঢুকলো।

কি গো, যাবে না?

বললাম, না।

নির্মলবাবু কি বলে গেলেন?

খুব খারাপ। সুজাতা ভাল মেয়ে নয়।

সে কি কথা?

স্ত্রী বসলো আমার সুমুখে। জিজ্ঞাসা করলে—

নির্মলবাবু নিজে এই কথা বলে গেলেন ?

বললাম, হ্যাঁ। সাত ঘাটের জল-খাওয়া মেয়ে। সেদিন যখন ওর সঙ্গে আমার দেখা হলো তখনই আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলে·না আমি কেমন করে ওর ঠিকানা জানলাম। একবার চা খেতে বললে, তারপর উঠে যখন চলে এলাম তখন আর চায়ের নামও করলে না। কেমন যেন অপ্রস্তুত ভাব।

অবিশ্বাসের হাসি হাসলে আমার স্ত্রী॥

এই দেখেই তোমার সন্দেহ হয়ে গেল ?

বলালাম, হবে না ? তার স্বামী নির্মলবাবু নিজে বলে গেলেন।— সুজাতা তার প্রথম জীবনে কি কাণ্ড করেছে ভগবান জানেন। তারপর ওই যে সতীকান্তবাবু—যাঁর বাড়িতে তোমরা নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলে, ওঁর সঙ্গে জুটে ছিল।

এইবার হো হো করে হেসে উঠলো আমার স্ত্রী।

ওই বুড়োর সঙ্গে ?

হ্যাঁ, এ সব ব্যাপারে বুড়ো-ছোঁড়া সব সমান। এখন শুনছি আর একটি ছোক্‌রাকে জুটিয়েছে। জুটিয়ে নির্মলবাবুকে দিয়েছে তাড়িয়ে।

নির্মলবাবু তো ছেলের বাপ ?

হ্যাঁ। এরাই হচ্ছে আজকালকার মেয়ে। আর এদের নিয়েই গল্প লিখতে বলেছিল সুজাতা। আমি লিখবো। সুজাতাকে নিয়েই গল্প লিখবো। লোকে হয়ত দূর দূর ছি ছি করবে, তবু আমাকে লিখতে হবে।

লিখলাম।

সুজাতাকে নিয়েই গল্প লিখলাম। লিখলাম তার যৌন-জীবনের ব্যাভিচারের কাহিনী।

সে কাহিনী ছাপাও হলো প্রসিদ্ধ একটি পত্রিকায়।

পড়ুক সুজাতা।

এই গল্পই সে লিখতে বলেছিল আমাকে। এই নাকি এ যুগের ধর্ম।

সেদিন বিকেলে বসে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ শুনলাম কে যেন বললে, নমস্কার!

পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি নির্মলবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন।

পড়েছেন তো?

কী?

আমি যে গল্প লিখেছি আপনাদের নিয়ে।

দিনরাত ট্যাক্সি চালাচ্ছি, আমার পড়বার সময় কোথায়?

বলতে বলতে সুমুখে এসে বসলেন নির্মলবাবু।

বললাম, চা খান।

না চা আর খাব না। সারাদিন শুধু চা-ই খাচ্ছি। একটা কথা বলতে এলাম আপনাকে।

নির্মলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, দেখা হয়েছে সুজাতার সঙ্গে?

বললাম, না।

থাক্ আর দেখা করবার দরকার নেই।

নির্মলবাবু বললেন, সেই যে ছেলেটির কথা বলেছিলাম আপনাকে—যার সঙ্গে সুজাতার ভাব হয়েছিল, ভেবেছিলাম সে আসবে না। এখন দেখছি—সে এসেছে! দুজনে বেশ হেসেখেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন আর আমার কথা বলবেন না সুজাতাকে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি গিয়েছিলেন সুজাতার কাছে?

নির্মলবাবু বললেন, যেতে হবে কেন? ট্যাক্সি নিয়ে পথে পথেই তো

ঘুরে বেড়াই, সেদিন দেখলাম নিউ মার্কেট থেকে হাসতে হাসতে বেরুচ্ছে দু'জনে।

এইতেই আপনি খুশী ?

আজ্ঞে হ্যাঁ এইটিই আমি চেয়েছিলাম ! আমি চেয়েছিলাম—সুজাতা সুখে থাক্। নির্মলবাবু বলতে লাগলেন, একা একা ছিল, ছেলেটাকে সাম্‌লাতে পারছিল না। তার ওপর ইস্কুলের কাজ—

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম নির্মলবাবুর মুখের দিকে। ভদ্রলোক বলেন কি ?

আপনার স্ত্রী—আপনার ছেলে ?

নির্মলবাবু হেঁটমুখে কি যেন ভাবতে লাগলেন। কথাটার জবাব দিতে পারছিলেন না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই এমন যে একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে যাবে—আমরা কেউ তা বুঝতে পারি নি।

নির্মলবাবু কথা বললেন না—কিন্তু কথা বললে অন্যলোক।

কার স্ত্রী ? কার ছেলে ?

তাকিয়ে দেখি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ছেলে কোলে নিয়ে সুজাতা। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে প্রিয়দর্শন এক যুবক।

সুজাতা বললে, নির্মল বলেছে বুঝি আমি ওর স্ত্রী ?

এই বলে নির্মলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, নির্মল ! তুমি বুঝি বলেছ এই ছেলে তোমার ?

আমার তো স্তম্ভিত হয়ে যাবার কথা। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম ওদের মুখের দিকে।

নির্মলবাবু বললেন, না। তা অবশ্য বলি নি।

সুজাতা বললে, নিশ্চয়ই বলেছ। নইলে উনি এই রকম গল্প কখনও লিখতে পারেন?

বলেই সেই আগন্তুক যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললে, অনিল, দাও তো কাগজখানা।

যুবকটির নাম বোধহয় অনিল। সে তার পকেট থেকে সেই পত্রিকাটি বের করে দিলে—যে পত্রিকায় আমার গল্প ছাপা হয়ে হয়েছিল।

কাগজখানা আমার হাতের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে সুজাতা বললে, আমাকে কোথায় টেনে নামিয়েছেন বলুন তো? মানুষ চেনার খুব বড়াই করেন আপনারা। কিন্তু এই আপনি চিনেছেন আমাকে? দিদি! দিদি!

সুজাতা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো আমার স্ত্রীকে।

আমার স্ত্রী বোধহয় দোরের পর্দার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিল। ডাকবামাত্র ভেতরে এলো। বললে, সবই শুনেছি আমি। কিন্তু এ কী ব্যাপার বল্ তো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝবে কেমন করে দিদি? কত্তাটি যে তার আগে গল্প লিখে ফেলেছেন। ওঁকে বলেছিলাম—এই যুগের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গল্প লিখতে। লিখলেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আসল ব্যাপারটা না জেনেই লিখলেন।

বললাম, আসল ব্যাপারটা তুমি তো জানালে না আমাকে।

সুজাতা বললে, আপনার গল্পের নায়ক-নায়িকারা বুঝি সবাই তাদের আসল ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে দিয়ে যায় তবে আপনি লেখেন?

এই বলে আমাকে অপ্রস্তুত করে নিয়ে সুজাতা হাসতে হাসতে বললে, তার চেয়ে বলুন আপনি এ যুগের সমস্যাটা ঠিক জানেন না।

সমস্যাটা কি শুনি?

সুজাতা বললে, বাঁচার সমস্যা। শুধু খেয়ে পরে বাঁচার সমস্যা

নয়, সব রকমে বয়ে যাওয়ার প্রলোভন থেকে নিজেকে বাঁচাবার সমস্যা।

বললাম, জানি।

জানেন যদি তো আপনার গল্পের সুজাতাকে অমন করে মারলেন কেন? অথচ এই তো সত্যিকারের সুজাতা, দিব্যি বেঁচে আছি আমি!

নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। বললাম, বেঁচে আবার আছো কোথায়? বলবো তাহলে সতীকান্তবাবুর কথা?

আমার স্ত্রী থামিয়ে দেবার চেষ্টা করলে।

আঃ, কি যা-তা নয় দিদি। সতীকান্ত মজুমদারকে উনি চেনেন না। আমি বেশ ভাল করেই চিনি। আমি চিনি আর ওই নির্মল চেনে। শুনুন তাহলে। পাকিস্তানের হাঙ্গামার কথা জানেন তো? সেই হাঙ্গামায় মাকে হারালাম, বাবাকে হারালাম, দিদি মলো জলে ঝাঁপ দিয়ে, আমি কোনোরকমে প্রাণে বাঁচলাম। আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা আমাকে নিয়ে এলো কলকাতায়। কাকা একা—নিজে রান্না করে খায় আর সতীকান্তবাবুর ইমারত-অট্টালিকায় কুলি খাটায়। এই তার চাকরি। ভালই হলো। আমি কাকার রান্না করতে লাগলাম। সেই কাকা একদিন খেয়ে দেয়ে কাজে গেল, সন্ধ্যে হলো রাত হলো—আর ফিরে এলো না। বাড়িতে আমি একা। পরের দিন মস্ত বড় একখানা গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাড়ির দরজায়। গাড়ি থেকে নামলেন সতীকান্ত মজুমদার। গাড়ি চালাচ্ছিল—এই নির্মল। নির্মল সতীকান্তবাবুর গাড়ির ড্রাইভার। শুনলাম কাকা নাকি কাল মারা গেছে। কুলি-মজুরেরা কাজ করছিল মস্ত বড় একটা চারতলা বাড়িতে। কাকা ছিল নীচে দাঁড়িয়ে। চারতলার ভারা থেকে একখানা ইঁট পড়েছিল তার তার মাথায়।

আমার মাথায় কি পড়লো জানি না। সতীকান্তবাবু আমার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর গাড়িতে চড়ে গেলাম তাঁর বাড়িতে।

তাঁর বাড়িতে কিন্তু তিনদিনের বেশি থাকা চললো না। আমার

মত অনাত্মীয়া এক সুন্দরী যুবতীকে নাকি বাড়িতে স্থান দেওয়া উচিত নয়।

সতীকান্তবাবু তাঁর বিধবা কন্যাকে একখানি বাড়ি দিয়েছিলেন বাগবাজারে। মেয়ে-জামাই মারা গেছে। বাড়িতে আছে মাত্র সেই মেয়ের একটি মাত্র ছেলে। সেই ছেলেটি তখন এম-এ পাশ করেছে, ডি-ফিল হয়েছে, কলেজে প্রফেসরী করবে না গল্প-উপন্যাস নিয়ে সাহিত্যিক হবে তাই ভাবছে। সতীকান্তবাবু সেই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখলেন আমাকে।

বালিগঞ্জ থেকে এলাম বাগবাজারে।

সতীকান্তবাবু তাঁর মেয়ের ছেলে অনিলের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিয়ে বললেন, তুমি অনিল আমার নাতি, আর তুমি সুজাতা হলে আমার নাতনী। ভালই হলো। অনিলের বোন ছিল না। একটি বোন পেলো। দুটি ভাই-বোনের মতন থাকো তোমরা। আমি রোজ এসে তত্ত্ব-তল্লাস করে যাব।

তত্ত্বতল্লাস বেশ ভালই করতে লাগলেন সতীকান্তবাবু। কোনোদিন আসেন বিকেলে কোনোদিন সন্ধ্যায়। গাড়িতে চড়িয়ে আমাকে এন্তার ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান কলকাতার পথে পথে। দামী দামী গয়না কিনে দেন। শাড়ি কিনে দেন। না নিলে রাগ করেন।

গাড়ি চালান কোনোদিন তিনি নিজে। কোনোদিন নির্মল।

এই পর্যন্ত বলেই সুজাতা থামলো। নির্মলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, নাও এবার নির্মল বল।

বললাম, আবার নির্মল কেন? তুমিই বল না। তোমার গল্প, তুমিই বল।

সুজাতা বললে, আমার গল্প হলেও এবার নির্মলের খানিকটা অংশ আছে।

বললাম, আমিও তো খানিকটা এমনিই লিখেছি। নিতান্ত সাদামাঠা সোজা গল্প।

সুজাতা বললে, আজ্ঞে না, সোজা নয়—রীতিমত বাঁকা। এই বাঁকের মুখেই অ্যাকসিডেণ্টের ভয়। কিন্তু নির্মল পাকা ড্রাইভার। অ্যাকসিডেণ্টসেই বাঁচিয়েছে।

নির্মলবাবু তাকালেন সুজাতার দিকে।

সুজাতা বললে, তাকাচ্ছো কি? এত বড় পরীক্ষায় পাশ করে শেষে এইখানে বলতে এলে—আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে?

নির্মল বললে, ছেলে নিয়ে কষ্ট হচ্ছিল, একা ছিলে। তা—

সুজাতা বললে, এ যুগের ধর্মই তো একা থাকা নির্মল। কারও দিকে কারও ফিরে তাকাবার অবসর নেই। সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে একাকী সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে। নিজের চোখে তুমি তো দেখলে আমাকে। নাও এবার তোমার কথা বল।'

নির্মলবাবু বললেন, সতীকান্তবাবুর কাজ তখন আমি ছাড়বো ছাড়বো করছি। ট্যাক্সির একটা পারমিট যোগাড় করেছি, কিছু টাকাও জমেছে হাতে, আরও কিছু টাকা হলেই হয়। দেখলাম সুজাতাকে খুব পেয়ার করছেন বাবু। হাজার হাজার টাকার গয়না কিনে দিচ্ছেন। ভাবলাম —ওকে বললে বোধ হয় টাকাটা যোগাড় হয়ে যায়। বলেই বসলাম একদিন। সুজাতা হাসলে একটুখানি। বললে, তুমি কি ভেবেছ আমি বুঝতে পেরেছি নির্মল। তুমিও পালাবো পালাবো করছো। আমিও পালাবো, কিন্তু বড় জোর আটকে পড়েছি একজায়গায়।

আমি তাকালাম সুজাতার দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় আটকে পড়েছিলে?

সুজাতা বললে, সতীকান্তবাবু যার সঙ্গে আমার ভাই পাতিয়ে দিয়েছিল সেই পাতানো ভাইটিকে ফেলে যেতে ইচ্ছে করছিল না।

সেই পাতানো ভাইটি যে অনিল—তার পাশেই বসে আছে, তা

আমি বুঝতে পেরেছিলাম। একটু হেসে বললাম, নাও বল, তারপর কি হলো।

নির্মলবাবু বললেন, সেদিন সেই নোংরা কথাটা তো আপনাকে বলতে গিয়েও বলতে পারি নি। সতীকান্তবাবু এত বুদ্ধিমান হয়েও যে এমন অবুঝের মত কাণ্ড করে বসবেন তাই-বা কে জানতো! আপিসের কাজের পর বাবু বললেন—চলো চৌরঙ্গী। চৌরঙ্গীর একটা বড় হোটেল থেকে বাবু বেরুলেন সিগ্রেট টানতে টানতে। চাল-চলন দেখে মনে হলো হুইস্কি-টুইস্কি কিছু খেয়ে এলেন। গাড়িতে বসেই বললেন, চলো বাগবাজার।

সর্বনাশ! যা ভেবেছিলুম তাই।

সুজাতাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আবার বললেন, চৌরঙ্গী।

সুজাতাও কি মদ খাবে না?

কিন্তু না। হোটেলেও গেল না, মদও খেল না। গাড়িটা আমি সোজাই নিয়ে যাচ্ছিলাম। মেট্রো পেরুতেই বাবু বললেন, রেড রোড ধর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

রাস্তার ধারে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বললেন, থামো।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যাবেন না?

না।

গাড়ি থামাতেই বাবু আমার হাতে পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়ে বললেন, ভাল আইসক্রীম নিয়ে এসো দেখি! আমার খুব পিপাসা পেয়েছে।

বুঝলুম বাবু আমাকে সরিয়ে দিতে চান সেখান থেকে। যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু কি করব, মনিবের হুকুম, গাড়ি থেকে নেমে গেলাম।

যাচ্ছি আর পেছন ফিরে ফিরে তাকাচ্ছি। জানি একটা অঘটন

কিছু ঘটবেই। অথচ আমি থামতেই পারি না, ফিরতেও পারি না। গাড়ির ভেতর কি হচ্ছে কিছু বুঝতেও পারছি না।

অনেক দূর চলে গেছি তখন—দেখি না, গাড়ির দরজা খুলে সুজাতা নামলো। বাবু নামলেন তার পিছু-পিছু। তারপর যা ভেবেছি ঠিক তাই। বাবু ধরলেন সুজাতাকে। সুজাতা চীৎকার করে উঠলো।

সুজাতাও গাড়ির কাছে আসবে না, বাবুও ছাড়বেন না।

আমি আর থাকতে পারলাম না। ছুটে চলে এলাম তাদের কাছে। কোনও কিছু না ভেবেই পেছন থেকে বাবুর ওপর চালিয়ে দিলাম ঘুষি। বাবু ফিরে দাঁড়িয়েই দেখলেন আমাকে। আমাকে দেখে লজ্জা হলো কি না কে জানে, তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠেই গাড়িটা দিলেন চালিয়ে।

আমরা দু'জন একটা গাছের তলায় রইলাম দাঁড়িয়ে। কি যে বলবো কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না।

সুজাতাই কথা বললে আগে।—কাঁপছো যে ?

সত্যি দেখলাম আমি কাঁপছি।

একজন কনেস্টবল এসে দাঁড়ালো আমাদের কাছে। বললে, চলুন —থানায় যেতে হবে।

বললাম, কেন ?

দূর থেকে গাছের-তলার আবছা অন্ধকারে সতীকান্তবাবুর ব্যাপারটা সে দেখেছে হয়ত।

বললাম, আমরা কেন থানায় যাব ? থানায় নিয়ে যেতে হয় তো নিয়ে যাও—।

বলেই আঙুল বাড়িয়ে সতীকান্তবাবুর চলন্ত গাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, ওই গাড়ি চড়ে যিনি পালিয়ে গেলেন তাঁকে নিয়ে যাও।

সুজাতার দিকে তাকিয়ে কনেস্টবল জিজ্ঞাসা করলে, ইনিকে ?

ফস করে বলে ফেললাম, আমার স্ত্রী।

কনেস্টবল চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, যান—বাড়ি যান।

সেপাই-এর হাত থেকে নিস্তার পেলাম, কিন্তু—

নির্মলবাবু সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন ।সুজাতার হাত থেকে নিস্তার পেলাম না ।

হো হো করে হেসে উঠলো সুজাতা ।

আমি আবার কি করলুম ?

নির্মলবাবু বললেন, স্বামী সাজিয়ে অভিনয় করিয়ে নিলে ।

সুজাতা বললে, হাঁ তা করিয়ে নিলাম। না করিয়ে উপায় ছিল না যে! আমার বয়সী একটা মেয়ে একা একা বাস করছে, তার ওপর বিয়ে হয় নি জানলে আর রক্ষে ছিল? পাড়ার যত বখাটে ছেলে পিছু লাগতো। আর এই যে—

বলে আমাকে দেখিয়ে বললে, ইনি ছিলেন কলম উঁচিয়ে বসে। বানিয়ে বানিয়ে গল্প লিখে আমার পিণ্ডি চটকাতেন ।

আমার স্ত্রী বললে, সিঁদুর পরতিস তো ?

সুজাতা বললে, হ্যাঁ পরতাম। নইলে সবাই ভাবতো—বেওয়ারিশ মাল। বাড়ীতে সিঁদুর ছিল না, তাই গড়ের মাঠ থেকে ট্যাক্সি করে ফিরেই আমার সেই পাতানো ভাইটির হাতের কাছে আমার কুঙ্কুমের শিশিটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—ছোট্ট করে দিয়ে দাও তো আমার সিঁথিতে ।

বিয়ে করলি কখন ?

সুজাতা বললে, তোমার পাশের বাড়িতে থাকতে থাকতে রেজেষ্ট্রি করে বিয়ো হলো। তারপর বর গেল বরের বাড়িতে, কনে এলো কনের বাড়িতে ।

বরটি তো তোর কাছে এসে থাকলেই পারতো !

সুজাতা হাসতে হাসতে তাকালে অনিলের দিকে। বললে, দাদামশাই-এর ভয়েই মরছিল আসবে কেমন করে? বাগবাজারের

বাড়ি বিক্রি করলে প্রফেসারীর চাকরি পেলে, তারপর এতদিন পরে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ছেলের বাপ এলেন তাঁর স্ত্রীর কাছে।

সুজাতার গল্প এইখানেই শেষ হলো।

বলেছিলাম, আবার আমি নতুন করে লিখবো তোমার কথা।

বলেছিলাম, কিন্তু লিখিনি।

সুজাতা বলেছিল, আপনি তো সাঁওতালদের নিয়ে অনেক গল্প লিখেছেন। শুনেছি নাকি তারা খুব ভাল।

বলেছিলাম, ভালও আছে, মন্দও আছে। দেবতার মত মানুষও আছে। আবার জানোয়ারের মতও আছে। সুজাতা ধরে বসলো, জানোয়ারের মত মানুষের গল্প বলুন, শুনবো।

বললাম, তা'হলে শোন।

বিলাসী বাউরীদের মেয়ে, আর নানকু সাঁওতাল।

চার বছর আগে ঝরিয়াতে তাদের প্রথম দেখা। সেইখানেই তাদের প্রেম, ভালবাসা যা-কিছু সব।

ঝরিয়া বাজারের কাছাকাছি একটা জায়গায় অনেকগুলো লোক জড়ো হয়েছিল একটা গাছের তলায়। সময়টা ছিল বসন্তকাল। সন্ধ্যার আগেই আকাশে উঠেছিল পূর্ণিমার চাঁদ। গাছে ফুল অবশ্য একটিও ছিল না, আর পায়ের নীচে মাটিটা ছিল শক্ত। হাট-বাজারে আনাগোনা, চারিদিকে হট্টগোল কোলাহল, প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম করবার উপযুক্ত পরিবেশ না হলেও, যে-দৃশ্য দেখবার জন্যে লোকজনের ভিড়ের মাঝখানে বিলাসী আর নানকু গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে দৃশ্যটা ছিল ভারি মজার।

চক্রাকার ভিড়ের মাঝখানে ডুগডুগি বাজিয়ে আর মজার মজার কথা বলে বলে একটা লোক খেলা দেখাচ্ছিল একটা বাঁদর আর একটা ছাগল নিয়ে। পালাটা ছিল প্রেমিক-প্রেমিকার মান আর অভিমানের।

বাঁদরটা ছিল রূপলাল, আর ছাগীটার নাম ছিল ঝুমরি।

লোকটা ডুগডুগি বাজানো থামিয়ে ডাকলে, বেটা রূপলাল !

রূপলাল তার মনিবের দিকে কটাক্ষ হান্‌লে।

মনিব বললে, দেখাও তো বেটা, কেমন করে তোমাদের ভালবাসা হয়েছিল।

রূপলাল মাটিতে শুয়ে পড়লো তক্ষুনি। তারপর তার কালো কালো হাতের লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলি দিয়ে তার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দু'টি চাপা দিলে।

লোকটি বললে, রূপলালের লজ্জা তো হবেই। তা হোক্‌। তবু প্রেম তো।

লোকটি বারম্বার অনুরোধ করতে লাগলো রূপলালকে। কিন্তু রূপলাল কিছুতেই রাজি হলো না। 'বাবু-সা'বরা দেখতে চাচ্ছে রূপলাল, দেখাও বেটা।

রূপলাল মাটি থেকে উঠলো না কিছুতেই। চোখে হাত চাপা দিয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়াতে লাগলো।

লোকটি বললে, যদি পয়সা পাও, তাহলে দেখাবে ?

রূপলাল এবার মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলে—দেখাবে।

দর্শকের কাছ থেকে ঘুরে ঘুরে আদায় করতে লাগলো রূপলালের মনিব।

লোকজনের ভিড়ের একদিকে দাঁড়িয়েছিল নান্‌কু, আর ঠিক তার চোখের সামনে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল বিলাসী।

নান্‌কু একটা পাঁচ নয়া দিলে লোকটাকে। বিলাসী সেটা দেখলে।

খেলা সুরু হয়ে গেল।

রূপলাল তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়াবার সে কি বিচিত্র ভঙ্গি। ছোট্ট একটি লাঠি দু'হাত দিয়ে কাঁধের উপর চেপে ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে ঝুমরির দিকে।

মাষ্টার বললে, এই তোদের প্রথম দেখা।—হাঁ হাঁ বেটা লজ্জা

কিসের ? দেখো দেখো—মজাসে দেখো। খুপ্ সুড়ৎ লড়কি, কেনো দেখবে না ?

ঝুমরি হাসল। সেও তাকিয়ে আছে রূপলালের দিকে। চোখ পড়তেই ঝুমরি তার চোখ নামিয়ে নিলে।

এদিকে তখন আর এক খেলা সুরু হয়ে গেছে।

নানকু একদৃষ্টে বিলাসীর দিকে তাকিয়েছিল। বিলাসী বাউরীদের মেয়ে। রঙ্ ফরসা। অপরূপ স্বাস্থ্যবতী যুবতী।

বিলাসীও তাকালে নানকুর দিকে।

নানকুর মাথায় কালো বাব্রি চুল, স্বাস্থ্য সুন্দর, সুগঠিত দেহ, চওড়া বুকের ছাতি, বড় বড় ছুটি চোখ আর সেই নিকষ কালো চোখের তারায় যেন স্বপ্নের আবেশ।

চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিলে বিলাসী।

কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারলে না চোখ নামিয়ে। আবার তাকালে। আবার।

ওদিকে রূপলাল বাঁদরটি তখন ছুই কাঁধের উপর খাটো লাঠিটি হাত দিয়ে চেপে ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল ঝুমরি ছাগলটার দিকে।

সর্ব্বনাশ !

নানকুর হাতের খাটো লাঠিটাও যে ঠিক তেমনি করে ধরা।

নানকু চট্ করে কাঁধ থেকে তার লাঠিটা নামিয়ে নিলে। তাই না দেখে বিলাসী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

বাঁদর রূপলাল তখন ছাগল ঝুমরির কাছে গিয়ে বসেছে। সেও তার কাঁধের লাঠি দিলে ফেলে। লাঠি ফেলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে ঝুমরিকে জড়িয়ে ধরলো। তার পর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেল।

ব্যাপার দেখে নানকুও হাসলে। বিলাসীও হাসলে।

নানকু ভিড় থেকে বেরিয়ে গেল। বিলাসী ভাবলে বুঝি সে চলে

গেল। কিন্তু না, গেল না। ঘুরে সে দাঁড়ালো গিয়ে বিলাসীর পাশে। বললে, হাসলি যে?

বিলাসী তার দিকে তাকিয়ে বললে, আমার খুশী।

তারপর দু'জনেই বেরিয়ে এলো রাস্তায়। জানা নেই, চেনা নেই, তবু তারা চললো আগে পিছে।

বিলাসী চললো আগে আগে, নান্‌কু তার পেছনে।

—আ মলো যা। তুই আমার সঙ্গে আসছিস কেনে?

নান্‌কু বললে, আমার খুশী।

আমি এইদিকে যাব।

আমিও ওইদিকে যাব।

বিলাসী থমকে দাঁড়ালো। বললে, আমি যাব নাই।

নান্‌কুও দাঁড়িয়ে পরলো। দাঁড়িয়েই সে তার ছোট লাঠিখানি কাঁধের উপর আড়াআড়িভাবে রেখে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলো। রূপলাল বাঁদরটাও ঠিক এমনি করেই তার লাঠিটা ধরেছিল। তাই না দেখে বিলাসী আবার হেসে ফেললে।

হাসলি যে?

বিলাসী আঙ্গুল বাড়িয়ে তার লাঠি ধরার ভঙ্গিটা দেখিয়ে দিয়ে আবার হাসতে হাসতে একেবারে গড়িয়ে পড়লো।

নান্‌কু মনের ভুলে তার লাঠিটা অমনি করে ধরেছিল। রূপলাল বাঁদরটার কথা মনে পড়তেই নামিয়ে নিল লাঠিটা।

বিলাসীর হাসি কিন্তু তখনও থামেনি। হাসতে হাসতেই বললে তুই রূপলাল বাঁদর।

আর তুই? নান্‌কু বললে, তুই বাঁদরী।

বিলাসী ফট্ করে এক চড় মেরে বসলো নান্‌কুকে।

নান্‌কু চড় খেয়ে চুপ করে থাকবার ছেলে নয়। হাত থেকে লাঠিটা

ফেলে দিয়ে চোখের নিমেষে দু'হাত দিয়ে আড়কোল করে তুলে ধরলে বিলাসীকে। বললে, দিই ফেলে?

বিলাসী দু'হাত দিয়ে নান্‌কুর গলাটা জড়িয়ে ধরলে।

সেই যে ধরলে, আর তাকে ছাড়লে না।

তারপর?

তারপর তাদের কত কথা, কত হাসি!

রোজই দেখা হয় দু'জনের। নান্‌কু রোজই বলে, চল পালাই এখান থেকে।

বিলাসী বলে, মুখেই তো বলছিস শুধু! চল্‌ না কোথায় যাবি।

বাস্‌, তারপর দু'জনেই একদিন উধাও!

ঝরিয়া থেকে হাজারীবাগ, হাজারীবাগ থেকে চাঁইবাসা, বারকাক্‌না, মানভূম, লোয়াগড়, লোয়াগড় থেকে রাণীগঞ্জ।

চার-চারটি বছর কী আনন্দে যে তাদের কেটেছে তা' আর বলবার নয়।

রাগ করেছে, অভিমান করেছে, ঝগড়া করেছে, এমন কি কেউ কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে নি, কিন্তু সবই যেন কুয়াশার মত। ক্ষণিকের জন্য। ভেসে ভেসে এসেছে, আবার তেমনি ভেসে ভেসেই চলে গেছে।

আজ প্রায় মাসখানেক ধরে কি যে হয়েছে তাদের—কুয়াশাটা যেন বেশ ঘন বলে মনে হচ্ছে। দুর্যোগের অন্ধকার কিনা তাই বা কে জানে। জোড়জানকী কয়লা-কুঠীতে এলো একটা নতুন মেয়ে এলো একটা নতুন মেয়ে এলো—মাইনু। মেয়েটা সাঁওতালের মেয়ে। বয়স বোধহয় উনিশ কি বড়-জোড় কুড়ি। সাঁওতাল পরগণার কোথায় কোন পার্বত্য উপত্যকায় গহন এক অরণ্যভূমির প্রান্তদেশে ছিল তাদের ছোট্ট একটি গ্রাম।

জঙ্গলের ভেতর কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘে খেয়েছে তার বাপকে। মহুয়া কুড়োতে গিয়ে একটা ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে

মরেছে তার মা। মার মাসী ছিল হাজারীবাগ জেলায়। খবর পেয়ে সেই মাসীই তাকে নিয়ে যায় প্রথমে। নিয়ে গিয়ে রেখেছিল তার নিজের কাছে। তারপর এক আড়কাঠীর কথায় ভুলে চলে এসেছে এই কুঠীতে—কয়লাখাদে কাজ করবে বলে।

সেই কাজ করতে গিয়েই নানকু দেখলে এই মেয়েটাকে। বিলাসী ছিল নানকুর সঙ্গে তবু সে থমকে থামলো! একদৃষ্টে চেয়ে রইলো মেয়েটার মুখের দিকে আর তার সেই হরিণের মত টানা-টানা দুটি চোখের দিকে। সদ্য ফোটা ফুলের মত নবযৌবনা শ্যামাঙ্গী সেই তরুণী বোধকরি বিচলিত হলো একটুখানি। সলজ্জ সুন্দর একটুখানি হেসে কি যেন জিজ্ঞাসা করলে নানকুকে। সাঁওতালি ভাষায় তার জবাব দিলে।

বিলাসী এখনও ঠিক বুঝতে পারেনা তাদের এই দুর্বোধ্য সাঁওতালী ভাষা। সে তখন নানকুকে টানছে সেখান থেকে চলে আসবার জন্যে। নানকু কিছুতেই আসবে না।

মেয়েট চলে গেল।

নান্‌কু তখনও দাঁড়িয়ে।

মেয়েটা ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

নান্‌কু যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে।

বিলাসীর সর্বাঙ্গে তখন জ্বালা ধরেছে। জিজ্ঞাসা করলে, এটা কি হলো শুনি ?

নান্‌কু বললে, কই কিছুই না তো!

নান্‌কু কি যেন ভাবছে। অন্যমনস্ক হয়ে গেছে সে।

বিলাসী জিজ্ঞাসা করলে, কি বললে মেয়েটা ? নান্‌কু বললে, কিছু না। এম্‌নি।

বিলাসী মুখ তুলে তাকালে নান্‌কুর দিকে। নান্‌কু যেন তন্ময় হয়ে গিয়ে নীরবে পথ চলছে।

বিলাসীর চোখ দু'টো জলে ভরে এলো।

নানকুর যেন সম্বিৎ ফিরে এলো এতক্ষণে। একটা হাত বাড়িয়ে বিলাসীকে কাছে টেনে এনে বললে ধ্যেৎ।

মেঘ উঠলো বিলাসীর জীবনে এই প্রথম মেঘ।

ভেবেছিল এ মেঘ কেটে যাবে। কিন্তু কাটলো না।

নানকু ছুটে ছুটে চলে যায় মাইনুর কাছে।

আর বুঝি তাকে সে ধরে রাখতে পারছে না।

মাইনু কি বিলাসীর চেয়েও সুন্দরী ? না, কখনও না। সে কথা সবাই স্বীকার করবে। তবু কিসের এ আকর্ষণ ? এক জাত, এক ভাষা ? না, তাও না।

বিলাসী ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারে না মাথাটা তার গোলমাল হয়ে যায়।

দিবারাত্রি মন কষাকষি চলে নানকুর সঙ্গে। মান অভিমানের পালা চলতে থাকে।

বিলাসীর আত্মসম্মানে এত বড় আঘাত আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি।

ঝম্ ঝম্ করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে একটুখানি আগে টপ টপ করে জল পড়ছে গাছের পাতা গড়িয়ে। সূর্য তখনও অস্ত যায়নি। জলে-ধোয়া চিকণ কচি গাছের পাতায় পড়ন্ত রৌদ্রের ছটা বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। ঝলমল করছে চারিদিক।

বিলাসী বাইরের দিকে তাকালে। দূর কলিয়ারীর চানকের মুখে হেড গিয়ারের ওপর আলো পড়েছে।

বাইরে বেরিয়ে এলো বিলাসী। বেশ ভাল লাগছে তার। নানকুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল মিটে গেছে।

হঠাৎ বিলাসীর নজর পড়লো আম গাছটার দিকে। বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধক্ করে উঠলো। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে মাইনু।

এই মরেছে !

মাইনু এসেছে নান্‌কুর সন্ধানে।

বিলাসীর ইচ্ছে করলে ছুটে গিয়ে মেয়েটার গালে ঠাস্‌ করে একটা চড় মেরে দেয়। এগিয়ে গেল সে আমগাছটার দিকে।

বিলাসী জিজ্ঞাসা করলে, কি চাস তুই ?

চুপ করে রইলো, মাইনু।

বিলাসী আবার বললে, কেনে এসেছিস এখানে ?

মেয়েটা বাংলা বোঝে না। সাঁওতালী ভাষায় কী যে সে বললে বিলাসী বুঝতে পারলে না। রেগে সে কটমট করে তাকালে মাইনুর মুখের দিকে। কিন্তু এ কী মেয়ে রে বাবা! একদৃষ্টে বিলাসীর দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে। মুক্তোর মত দাঁত। স্নিগ্ধ সুন্দর সে হাসি। এমন নির্দোষ পবিত্র হাসি যে হাসতে পারে, রাগ সে তার ওপর করবে কেমন করে ?

নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশুর মত সরল এ মেয়েটা। তাহ'লে এলো কেন এখানে ? নান্‌কুর সন্ধানে এসেছে নিশ্চয়ই।

বিলাসী তার দুই কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছিস ? কাকে খুঁজছিস তুই ?

মেয়েটা কোনও কথা বলে না। শুধু হাসে।

জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বিলাসী আবার জিজ্ঞাসা করলে, বল্‌! তোর নিজের ভাষাতেই বল্‌। আমি ঠিক বুঝতে পারব।

তবু বলে না।

আবার সেই হাসি!

এবার হাসতে হাসতে বিলাসীর গায়ে সে ঢলে পড়লো। বিলাসীও না হেসে থাকতে পারলো না। বললে, নান্‌কুকে খুঁজছিস ? নান্‌কু না—ন্‌—কু।

মাইনু মাথা নেড়ে বললে, হুঁ।

তবে রে শয়তান! নানকুর জন্যেই এসেছ তুমি।

বিলাসী এবার তাকে জোর করে সরিয়ে দিলে। বললে নান্‌কু নেই এখানে। যা বাড়ী যা। আর আসিস না এদিকে। এলে মারবো।

মারের ইঙ্গিতটা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে বিলাসী।

ভাষা না বুঝলেও এটা বুঝতে দেরি হোল না মাইনুর।

আবার হাসতে লাগলো মেয়েটা। হেসে হেসে বিলাসীর হাতটা টেনে ধরে সে নিজের গালের ওপর রাখলে। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে—নে, মার!

বিলাসী তাকে পেছন ফিরিয়ে একটুখানি ঠেলা দিয়ে বললে আর ঢং করতে হয় না। যা বাড়ী যা।

মাইনু চলে গেল। বিলাসী দাঁড়িয়ে রইলো সেইখানে। দেখলে মেয়েটা যাচ্ছে, হাসছে আর ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

না, আর নয়। বিলাসী ভাবলে এখানে আর থাকা চলবে না। সেইদিনই রাত্রে সে নান্‌কুকে বললে, এখানে আর থাকবো না আমরা। কালই চল্‌ চলে যাই এখান্‌ থেকে।

নান্‌কু বললে, কোথায় যাবি?

চাম্‌ড়া-কলে।

চামড়া-কল মানে চামড়া ট্যান্‌ করবার ট্যানারি। ট্যানারিতে কেউ সহজে কাজ করতে চায় না। কাজেই সেখানে গেলেই নাকি কাজ পাওয়া যায়। মজুরীও অনেক বেশী।

চামড়া কলের নাম শুনে নান্‌কুর মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল। বললে, নাকি কাপড় বেঁধে সেখানে কাজ করতে হয়। আমি যাব নাই তুই যা।

বিলাসী বললে তা যাবি কেন? মাইনুর সর্বনাশ না করে এখান থেকে তুই যাবি নাই তা আমি জানি।

আবার সুরু হলো তাদের ঝগড়া। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঝগড়া চললো।

ঝগড়া শেষ যখন হলো দেখা গেল নান্‌কু রাজী হয়েছে চামড়ার কলে গিয়ে কাজ করতে।

চামড়া-কলের ম্যানেজার বুড়ো একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

বিলাসী তার পরের দিন সোজা সাহেবের বাংলোয় গিয়ে হাজির।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, কি চাই?

বিলাসী বললে, কাজ।

পারবি চামড়া কলে কাজ করতে?

বিলাসী বললে, খুব পারব। থাকবার জায়গা দিতে হবে কিন্তু।

সাহেব বললে দেবো। কখন থেকে কাজ করবি?

কাল থেকে।

সাহেব ডাকলে, জোনস!

প্রিয়দর্শন এক যুবক এসে দাঁড়ালো।

সাহেব বললে এ কি বলছে, শোন।

জোনস বললে এসো আমার সঙ্গে।

রেল লাইনের দু-পাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে হরিতকীর জঙ্গল। আর সেই জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে ছায়া-ঢাকা দুটি পথ। একটি পায়ে চলার। একটি গাড়ী-ঘোড়ার। তারই মাঝে মাঝে ছবির মত সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ী আর জঙ্গলের একেবারে শেষ প্রান্তে ট্যানারি।

জঙ্গলের ভেতর জনমানবহীন সুন্দর সুসজ্জিত একটি বাংলোর ফটক পেরিয়ে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো জোনস। পেছনে বিলাসী।

বিলাসীর দিকে তাকিয়ে জোন্‌স্‌ বললে, বোসো।

বলেই নিজে একটি চেয়ারে বসে বিলাসীকে একটি চেয়ার দেখিয়ে দিলে।

লোকটা পাগল নাকি? কামিনের কাজ করতে এসেছে বিলাসী—

রূপ-যৌবন না হয় আছে, ফরসা একখানা শাড়ীও না হয় সে পরে এসেছে, কিন্তু এ কিরকম কথা ? চেয়ারে বসে কথা বলবে সাহেবের সঙ্গে !

বিলাসী বললে, বলুন আপনি কি বলবেন। আমি এইখানে দাঁড়াই।

জোন্‌স্‌ ইনিয়ে-বিনিয়ে যা বললে বিলাসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনলে। জোন্‌স্‌ বললে, সে নাকি ওই বুড়ো সাহেবের একমাত্র ভাইপো। সাহেব মরে গেলেই এই ট্যানারি, এখানকার যা কিছু সবের মালিক হবে সে। তার মা নেই, ভাই বোন কেউ নেই। এই পৃথিবীতে সে একা। অথচ এমনি তার দুর্ভাগ্য, কোনও মেয়েই তার গৃহিণী হয়ে এখানে এসে থাকতে পারছে না। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান চার-চারটি মেয়েকে সে এখানে এনে রেখেছিল। একে একে সবাই পালিয়ে গেছে। একটি মেয়েকে বিয়েও করেছিল সে। মেয়েটি তাকে ডাইভোর্স করে দিয়েছে। তাই সে প্রতিজ্ঞা করেছে, তাদের ক্রিশ্চান-সমাজের কোনও মেয়েকে সে বিয়ে করবে না। বিয়ে করবে এখানকার যে কোনও একটি বাঙ্গালী মেয়েকে।

জোনস্‌ চেয়ার ছেড়ে বিলাসীর কাছে এগিয়ে এসে তার হাত দুটো চেপে ধরলে। থর থর করে সে তখন কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে বললে, তোমার মতন একটি মেয়েকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এতদিন পরে ঈশ্বর তোমাকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে। তোমাকে আমি আমার হৃদয়ের রাণী করে রাখবো। মাইরি বলছি ডার্লিং।

বিলাসীরও তখন থর থর করে কাঁপবার মতন অবস্থা। তবে সেটা তার ধাতে নেই। তাই সে খাড়া দাঁড়িয়ে রইলো।

জোন্‌সের আপাদমস্তক বেশ ভাল করে একবার দেখে নিলে।

খুব হাসি পাচ্ছিল বিলাসীর। কিন্তু কি জানি কেন, বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। হাসতে সে পারলে না।

বিলাসী নীচের দিকে তাকিয়েছিল। জোন্‌স্‌ হাত দিয়ে তার মুখখানি

তুলে ধরলে। বললে, হাউ সুইট ইউ আর। তোমার নাম কি ডার্লিং?

বিলাসী।

জোন্‌স বললে, বিলাসী, এই বাড়ী, এখনকার যা কিছু সব—সব তোমার।

বিলাসী জোন্‌সের মুখের দিকে তাকালো। তার দুটি চোখের দিকে? ছোঁড়াটা কি সত্যিই পাগল? না, দেখে তো পাগল মনে হয় না। নিতান্ত অসহায়, একটুখানি স্নেহের কাঙ্গাল মিনতি-কাতর দু'টি চোখ।

বিলাসী বললে, ভেবে দেখি। আজ আমাকে ছেড়ে দাও।

জোনস্ জিজ্ঞাসা করলে, কবে আসবে?

সে কথা ঠিক বলতে পারছি না।

জোনস্ বললে, আমি যাব তোমার কাছে। কোথায় থাকো তুমি?

বিলাসী বললে, জোড়জানকী কুঠিতে। কয়লার কুঠি।

সে তো এই কাছেই।

জোনস্ আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বিলাসী শুনলে না। শুনতে চাইলে না। তাড়াতাড়ি চলে এলো সেখান থেকে।

জোনস্ তার পিছু পিছু বাইরে এসে বিলাসীর একখানা হাত আবার চেপে ধরলে। বললে, তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে বিলাসী। ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। লেট মি কিস্ ইউ মাই ডার্লিং।

এই বলে সে আরও একটুখানি ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা করছিল। ইংরেজি কথাটার মানে একদম বুঝতে পারেনি বিলাসী। কিন্তু পৃথিবীর সব ভাষাতেই এমন সব কথা আছে যার মানে বোঝবার জন্যে বই পড়তে হয় না। মানুষের চোখে মুখে সে ভাষা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হলো। বিলাসী তার হাতখানা জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে একরকম ছুটেই পালিয়ে এলো সেখান থেকে।

জোনসের চোখের সামনে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। লজ্জাও

যেন হলো একটুখানি। সেইদিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

বিলাসী ফিরে এলো জোড়জানকীতে।

বাড়ীতে গিয়ে দেখে, নান্‌কু নেই। এ সময় থাকবার কথাও নয়। খাদে খাটতে গেছে।

বিলাসীর মাথার ভেতরটা কেমন যেন ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছে। মনে হচ্ছে যেন মদ খেয়েছে। একা-একা ঘরেও সে বেশীক্ষণ থাকতে পারলে না। বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে।

সোজা সে চলে যাচ্ছিল সুমুখের দিকে।

কোথায় যাচ্ছে তা সে নিজেও জানে না।

এ যেন তার নিরুদ্দেশ যাত্রা।

বাঁদিকে সাইডিং লাইন। ওয়াগনে কয়লা বোঝাই হচ্ছে। কতক-গুলো মেয়ে গান ধরেছে সেদিক দিয়ে যেতে মন সরলো না বিলাসীর। পায়ে-চলা পথটা ছেড়ে দিয়ে বিলাসী ঢুকলো গিয়ে পলাশের জঙ্গলে। সারি সারি পলাশের গাছ। বড় বড় ফুলে লাল হয়ে আছে গাছগুলো। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে জায়গাটি।

ডানদিকে ছোট একটা বস্তি। কয়েকখানা মাত্র মাটির ঘর। মাইনু থাকে এই বস্তিতে। বিলাসী একবার সেইদিকে তাকিয়ে দেখলে। লোক-জন কেউ আছে বলে মনে হলো না। কাজের এখনও ছুটি হয়নি কারও। কতকগুলো মুরগী ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু।

বিলাসী এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কে যেন ডাকলে তাকে।

থম্‌কে থামলো বিলাসী। ডাকটা কোনদিক থেকে এলো বুঝতে পারছিল না সে।

আবার ডাকলে—হেই।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে একটা মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সাঁওতালদের মেয়ে।

মেয়েটাকে বিলাসী কোনোদিন দেখেছে বলে মনে হলো না। জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে ডাকছো ?

পরিষ্কার বাংলায় বললে মেয়েটি ; হ্যাঁ, তোমাকেই ডাকছি। তোমার নাম জানি না। তুমিই নানকুর বৌ ?

বিলাসী বললে, হ্যাঁ।

মেয়েটি বললে, আমি মাইনুর মাসী।

বিলাসী তার মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে। মেয়েটি বললে, আমিই এখানে এনেছি মাইনুকে। মেয়েটা ভারি বোকা। খালি ফিক্ ফিক্ করে হাসে। কিন্তু খুব ভাল মেয়ে।

বিলাসী বললে, জানি।

জানো তুমি মাইনুকে ? তবে শোনো !

এই বলে মাইনুর মাসী তাকে একটা গাছের তলায় টেনে নিয়ে গিয়ে বসালে। নিজেও বসলো। বললে, মাইনু কয়লা খাদে কাজ কখনও করে নাই। জংলী মেয়ে তো ! জঙ্গলে পালাতে চাইছে। ভাল একটি কাজ ওকে দিতে পারছি না ভাই।

বিলাসী ম্লান একটু হাসলে। বললে, ভাল কাজ ? কেনে ভাল কাজ তো সে পেয়েছে।

কথাটার ইঙ্গিতটা মাইনুর মাসী ধরতে পারলে না। ঘার নেড়ে বললে, না না এখনও পায় নাই। নানকু বলেছে, পাবে। তা ভাগ্যি ভালো যে নানকুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। নানকুর সঙ্গে বড়বাবুর নাকি খুব ভাব ; বড়বাবুকে বলে নানকু তার একটি ভাল কাজ করে দেবে।

বিলাসী বললে, নানকু করে দিবেক ?

মাইনুর মাসী বললে, হাঁ ভাই, নানকু কসম খেয়েছে। আজ মাইনুকে সেইখানেই নিয়ে গেইছে। এখনও ফিরে নাই।

বিলাসী আবার হাসলো একটুখানি।

হাসছো যে ?

না হাসি নাই। এমনিই।

বিলাসী উঠতে যাচ্ছিল। মাইনুর মাসী তাকে উঠতে দিলে না। বললে, বোসো না ভাই, কথা কইবার মানুষ পাই না।

হঠাৎ কিসের যেন একটা শব্দে দু'জনেই মুখ তুলে তাকালো।

দেখলে, রক্তরাঙা পলাশ গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছুটতে ছুটতে সেইদিকেই এগিয়ে আসছে মাইনু। টলতে টলতে ছুটে এসে একেবারে আছাড় খেয়ে পড়লো তার মাসীর গায়ের ওপর। । দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

এই মেয়েটাকে শুধু হাসতেই দেখেছে বিলাসী। কোনোদিন কাঁদতে দেখেনি। তাই সে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

মেয়েটা তার শত্রু। আজ তার কান্না দেখে বিলাসীর হাসাই বোধকরি উচিত ছিল, কিন্তু মানুষের চরিত্রের হেঁয়ালী বোঝা ভার। হাসতে সে কিছুতেই পারলে না।

বুঝতে সে অবশ্য পারলো সবই।

না বুঝবার আছেই বা কি?

মাইনুর মাসী কিন্তু তখনও কিছুই বুঝতে পারেনি। শুধু একটা অজানা আতঙ্কে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গিয়ে সাঁওতালী ভাষায় ক্রমাগত সে তাকে জিজ্ঞাস করতে লাগলো, কি হলো বল্? খালি খালি কাঁদছে ছাখো। কি হয়েছে বল্ না!

যা হবার তাই হয়েছে।

বলেই বিলাসী উঠে দাঁড়ালো।

মাইনুর মাসী তখন কিছুই বুঝতে পারছে না। বিলাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো হাঁ করে।

বিলাসী বললে, নানকু ওর একটা ভাল কাজ করে দেবে বলেছিল— তাই দিয়েছে।

তবু বুঝতে পারলে না বোকা মেয়ে।

মাসী বোনঝি দুটোই সমান।

গায়ের রং কালো হলে কি হবে শরীরের রক্তের রং সেই একই রকম—টকটকে লাল। সেই লাল রক্তের দাগ লেগেছিল মাইনুর কাপড়ে। মাইনুর মাসীকে সেইটে দেখিয়ে দিয়ে বিলাসী বললে, ওই দ্যাখ জংলী কোথাকার!

বলেই সে ছুটে পালালো সেখান থেকে।

বিলাসী অন্যমনস্ক হয়ে ছুটছিল তার ঘরের দিকে। কিন্তু ঘর কোথায়? কার সঙ্গে ঘর বেঁধেছে সে। একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে থামল বিলাসী!

—বিলাসী!

ফিরে দাঁড়াতেই দেখে, নানকু আসছে তার দিকে এগিয়ে! কি হলো বিলাসী? চামড়া-কলে যাবি?

জানি না।

বলেই সে আবার ছুটলো।

নানকু বললে, কোথায় যে-ছিস ছুটতে ছুটতে?

বিলাসী মুখ ফিরিয়ে বললে, তোর কাছ থেকে দূরে—অনেক দূরে।

কিন্তু সে কথার মানে বুঝতে পারলে না নানকু। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিলাসী ছুটছে—ছুটছে। চামড়াকলের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। জোনস তাকে যেতে বলেছে।

কিন্তু সেও একটা মানুষ নামক জন্তু কিনা তাই বা কে জানে।

॥ সমাপ্ত ॥